শেখার সেতু

গণিত

আমাদের পরিবেশ

চতুর্থ শ্রেণি

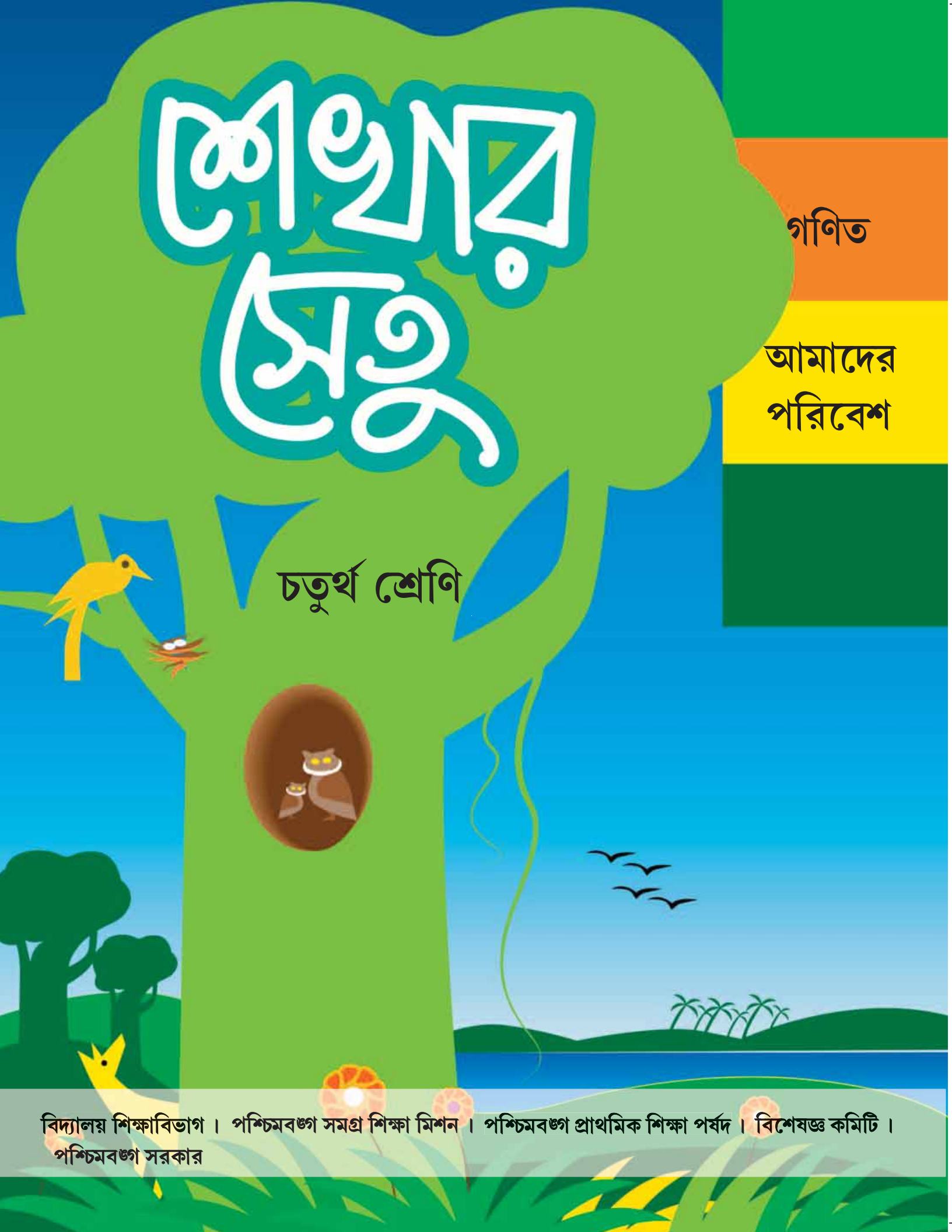

বিদ্যালয় শিক্ষাবিভাগ । পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন । পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ । বিশেষজ্ঞ কমিটি ।
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শেখার সেতু

গণিত

আমাদের পরিবেশ

চতুর্থ শ্রেণি

सत्यमेव जयते

বিদ্যালয় শিক্ষাবিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বিকাশ ভবন,
কলকাতা - ৭০০০৯১

পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন
বিকাশ ভবন,
কলকাতা - ৭০০০৯১

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০০১৬

বিশেষজ্ঞ কমিটি
নিবেদিতা ভবন, পঞ্চমতল
বিধাননগর,
কলকাতা : ৭০০০৯১

বিদ্যালয় শিক্ষাবিভাগ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিকাশ ভবন, কলকাতা - ৭০০ ০৯১

পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন

বিকাশ ভবন,
কলকাতা - ৭০০০৯১

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

ডি কে ৭/১ বিধাননগর, সেক্টর-২
কলকাতা-৭০০০৯১

বিশেষজ্ঞ কমিটি

নিবেদিতা ভবন, পঞ্চমতল
বিধাননগর, কলকাতা : ৭০০০৯১

Neither this book nor any keys, hints, comment, note, meaning, connotations, annotations, answers and solutions by way of questions and answers or otherwise should be printed, published or sold without the prior approval in writing of the Director of School Education, West Bengal. Any person infringing this condition shall be liable to penalty under the West Bengal Nationalised Text Books Act, 1977.

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০২১

মুদ্রক
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫৬

सत्यमेव जयते

ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি **সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র** রূপে গড়ে তুলতে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করছি এবং তার সকল নাগরিক যাতে : সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক **ন্যায়বিচার**; চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার **স্বাধীনতা**; সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের **সমতা** প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তি-সম্ভ্রম ও জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি সুনিশ্চিত করে **সৌভ্রাতৃত্ব** গড়ে তুলতে; **আমাদের গণপরিষদে**, আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, **এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ করছি, বিধিবদ্ধ করছি** এবং **নিজেদের অর্পণ করছি**।

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens : JUSTICE, social, economic and political; LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship; EQUALITY of status and of opportunity and to promote among them all – FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation; IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

ভারতীয় নাগরিকের মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য

মৌলিক অধিকার (ভারতীয় সংবিধানের ১৪-৩৫ নং ধারা)

১. সাম্যের অধিকার

● আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান এবং আইন সকলকে সমানভাবে রক্ষা করবে;

● জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ, জন্মস্থান প্রভৃতি কারণে রাষ্ট্র কোনো নাগরিকের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না;

● সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে যোগ্যতা অনুসারে সকলের সমান অধিকার থাকবে;

● অস্পৃশ্যতার বিলোপসাধনের কথা ঘোষণা করা এবং অস্পৃশ্যতা-আচরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে; এবং

● উপাধি গ্রহণ ও ব্যবহারের ওপর বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

২. স্বাধীনতার অধিকার

● বাক্‌স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের অধিকার;

● শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার;

● সংঘ ও সমিতি গঠনের অধিকার;

● ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার;

● ভারতের যে-কোনো স্থানে স্বাধীনভাবে বসবাস করার অধিকার;

● যে-কোনো জীবিকার, পেশার বা ব্যাবসাবাণিজ্যের অধিকার;

● আইন অমান্য করার কারণে অভিযুক্তকে কেবল প্রচলিত আইন অনুসারে শাস্তি দেওয়া যাবে;

● একই অপরাধের জন্য কোনো ব্যক্তিকে একাধিকবার শাস্তি দেওয়া যাবে না;

● কোনো অভিযুক্তকে আদালতে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাবে না;

● জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার;

● যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা যাবে না; এবং আটক ব্যক্তিকে আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে।

৩. শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার

● কোনো ব্যক্তিকে ক্রয়বিক্রয় করা বা বেগার খাটানো যাবে না;

● চোদ্দো বছরের কমবয়স্ক শিশুদের খনি, কারখানা বা অন্য কোনো বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত করা যাবে না।

৪. ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার

● প্রত্যেক ব্যক্তির বিবেকের স্বাধীনতা এবং ধর্মপালন ও প্রচারের স্বাধীনতা আছে;

● প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায় ধর্মপ্রচারের স্বার্থে সংস্থা স্থাপন এবং সম্পত্তি অর্জন করতে পারবে;

● কোনো বিশেষ ধর্ম প্রসারের জন্য কোনো ব্যক্তিকে করদানে বাধ্য করা যাবে না;

● সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া যাবে না এবং সরকারের দ্বারা স্বীকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া যাবে না।

৫. সংস্কৃতি ও শিক্ষাবিষয়ক অধিকার

● সব শ্রেণির নাগরিক নিজস্ব ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতির বিকাশ ও সংরক্ষণ করতে পারবে;

● রাষ্ট্র পরিচালিত বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে ধর্ম, জাত বা ভাষার অজুহাতে বঞ্চিত করা যাবে না;

● ধর্ম অথবা ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি নিজেদের পছন্দমতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করতে পারবে।

৬. শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার

● মৌলিক অধিকারগুলিকে বলবৎ ও কার্যকর করার জন্য নাগরিকেরা সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের কাছে আবেদন করতে পারবে।

মৌলিক কর্তব্য

(ভারতীয় সংবিধানের ৫১এ নং ধারা)

১। সংবিধান মান্য করা এবং সংবিধানের আদর্শ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় স্তোত্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন;

২। যেসব মহান আদর্শ জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল, সেগুলিকে সযত্নে সংরক্ষণ ও অনুসরণ;

৩। ভারতের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও সংহতিকে সমর্থন ও সংরক্ষণ;

৪। দেশরক্ষা ও জাতীয় সেবামূলক কার্যের আহ্বানে সাড়া দেওয়া;

৫। ধর্মগত, ভাষাগত ও আঞ্চলিক বা শ্রেণিগত ভিন্নতার ঊর্ধ্বে উঠে ভারতীয় জনগণের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের বিকাশসাধন এবং নারীর মর্যাদাহানিকর প্রথাসমূহকে বর্জন;

৬। আমাদের মিশ্র সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যকে মূল্যদান ও সংরক্ষণ;

৭। বনভূমি, হ্রদ, নদনদী এবং বন্যপ্রাণীসহ প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নয়নসাধন এবং জীবন্ত প্রাণীসমূহের প্রতি মমত্ব পোষণ;

৮। বৈজ্ঞানিক মানসিকতা, মানবিকতা, অনুসন্ধিৎসা ও সংস্কারমুখী দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারসাধন;

৯। সরকারি সম্পত্তির সংরক্ষণ ও হিংসা বর্জন;

১০। সর্বপ্রকার ব্যক্তিগত ও যৌথ কর্মপ্রচেষ্টাকে উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্নপ্রকার কার্যকলাপের উৎকর্ষসাধন;

এবং

১১। ৬-১৪ বছর বয়স্ক প্রতিটি শিশুকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা তার পিতা-মাতা বা অভিভাবকের কর্তব্য।

মুখবন্ধ

প্রাথমিক স্তরের রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় বিশেষজ্ঞ কমিটির তত্ত্বাবধানে অতিমারির আবহে প্রায় সমস্ত বিষয়ে ব্রিজ মেটিরিয়াল 'পঠন সেতু' অত্যন্ত দ্রুততার সাথে প্রকাশ করা হলো। অতিমারির কারণে বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক এবং নিয়মিত পঠন-পাঠনে দীর্ঘদিন ছেদ করার কারণে শিখনের ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের যে ঘাটতি তৈরি হয়ে থাকতে পারে - এই 'ব্রিজ মেটিরিয়াল'টি আশা করা যায় সেই ঘাটতি পূরণে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। বিদ্যালয়গুলি পুনরায় চালু হওয়ার পর অন্তত ১০০ দিন সকল শিক্ষার্থীর জন্য এটি ব্যবহৃত হবে। প্রয়োজন বুঝে বিশেষ কিছু শিক্ষার্থীর জন্য 'মেটিরিয়াল'টি ব্যবহারের মেয়াদ আরও কিছুদিন বাড়ানো যেতে পারে।

এই 'ব্রিজ মেটিরিয়াল'টি বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের সংযোগ ও সেতু নির্মাণের পাশাপাশি পরিচিতি ও শিখনের মানোন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

শিক্ষিকা/শিক্ষকেরা প্রয়োজন অনুযায়ী এই সামগ্রীর সঙ্গে পাঠ্য বইকে ব্যবহার করবেন। এই 'মেটিরিয়াল'টি ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁদের মৌলিকতার পাশাপাশি একটি সার্বিক ভাবনা ক্রিয়াশীল রাখবেন - এই আশা রাখি। একথা মনে রাখা জরুরি, এই 'ব্রিজ মেটিরিয়াল'টি নিয়মিত পাঠক্রমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ব্যবহৃত হবে এবং এর ভিত্তিতেই শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক মূল্যায়ন চলবে।

গ্রন্থ প্রকাশের মুহূর্তে এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

ডিসেম্বর, ২০২১
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ভবন
ডি কে - ৭/১, সেক্টর ২
বিধাননগর, কলকাতা ৭০০ ০৯১

মানিক ভট্টাচার্য
সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

প্রাক্‌কথন

পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের পরিকল্পনায় ও বিশেষজ্ঞ কমিটির তত্ত্বাবধানে করোনা আতিমারির আবহেও রাজ্যের শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে প্রাথমিক স্তরের সকল বিষয়ের 'ব্রিজ মেটিরিয়াল' প্রস্তুত করা হয়েছে। দীর্ঘ এক বছরের বেশি সময় ধরে বিদ্যালয়ে স্বাভাবিক পঠন-পাঠন বন্ধ থাকায় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যে শিখন-ঘাটতি স্বাভাবিকভাবেই সৃষ্টি হয়েছে সেই অভাব পূরণ করতে এই 'ব্রিজ মেটিরিয়াল'টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলেই আশা করা যায়। বিদ্যালয়গুলি পুনরায় চালু হওয়ার পর অন্তত ১০০ দিন সকল শিক্ষার্থীর জন্য এটি ব্যবহৃত হবে। প্রয়োজন বুঝে বিশেষ কিছু শিক্ষার্থীর জন্য 'মেটিরিয়াল'টি ব্যবহারের মেয়াদ আরও কিছুদিন বাড়ানো যেতে পারে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন এই 'ব্রিজ মেটিরিয়াল'টির মুখ্য উদ্দেশ্য হলো বিগত দুটি শিক্ষাবর্ষের দুটি শ্রেণির বিষয়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ শিখন সামর্থ্যের সঙ্গে বর্তমান শিক্ষাবর্ষের শ্রেণি-সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় শিখন সামর্থ্যের সংযোগ ও সেতু নির্মাণ।

শিক্ষিকা/শিক্ষকদের কাছে আমাদের আবেদন, 'ব্রিজ মেটিরিয়াল'টি প্রয়োজনীয় কাম্য শিখন সামর্থ্যের ভিত্তিতে তৈরি হওয়ার কারণে, এটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁরা প্রয়োজন অনুযায়ী এই সামগ্রীর সঙ্গে পাঠ্য বইকে জুড়ে নিতে পারবেন। আরো উল্লেখযোগ্য বিষয়, এই 'ব্রিজ মেটিরেয়াল'টি নিয়মিত পাঠক্রমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ব্যবহৃত হবে এবং এর ভিত্তিতেই শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক মূল্যায়ন চলবে।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রস্তুত করেছেন। বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার প্রভূত সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক ব্রাত্য বসু প্রয়োজনীয় মতামত এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

অভীক মজুমদার

চেয়ারম্যান
'বিশেষজ্ঞ কমিটি'
বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ডিসেম্বর, ২০২১
নিবেদিতা ভবন, পঞ্চমতল
বিধাননগর, কলকাতা : ৭০০ ০৯১

শেখার সেতু

গণিত

सत्यमेव जयते

বিদ্যালয় শিক্ষাবিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বিকাশ ভবন,
কলকাতা - ৭০০০৯১

পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন
বিকাশ ভবন,
কলকাতা - ৭০০০৯১

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০০১৬

বিশেষজ্ঞ কমিটি
নিবেদিতা ভবন, পঞ্চমতল
বিধাননগর,
কলকাতা : ৭০০০৯১

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

অভীক মজুমদার
(চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়
(সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ)

পরিকল্পনা • সম্পাদনা • তত্ত্বাবধান

ঋত্বিক মল্লিক পূর্ণেন্দু চ্যাটার্জী রাতুল গুহ

বিষয় সম্পাদন ও বিন্যাস

মলয় কৃষ্ণ মজুমদার

অশোক তরু মণ্ডল খোকন দাস

বিষয় নির্মাণ

মনীশ দাস দীপক রায় উৎপল মুখোপাধ্যায়

মলি পাল ঘোষ দেবাশিস মুখার্জী সুজয় শিকদার

Supported by

Sr. Gloria Mary A.C Punam Pradhan Pinky Pari Thapa

Chedup Singar (Tamang) Manohar Chamling Rai Sandhya Yonzon

Tshering Yolmo Nikita Gurung

সূচিপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
1.	চার অঙ্কের সংখ্যা	1-3
2.	চার অঙ্কের সংখ্যার যোগ ও বিয়োগ	4-7
3.	গুণ	8-11
4.	ভাগ	12-14
5.	গুনের নামতা	15
6.	বছর-মাস-সপ্তাহ-দিন	16-18
7.	দিন-ঘন্টা-মিনিট-সেকেন্ড	19-20
8.	ভগ্নাংশ	21-23
9.	দৈর্ঘ্য পরিমাপ	24-25
10.	ভরের পরিমাপ	26
11.	আয়তনের পরিমাপ	27
12.	দশমিক ভগ্নাংশ	28
13.	গুণিতক	29-30
14.	গুণনীয়ক	31-32
15.	বিভাজ্যতার শর্ত	33-34
16.	মৌলিক সংখ্যা ও যৌগিক সংখ্যা	35
17.	ত্রিভুজ	36-37
18.	পরিসীমা	38
19.	ঐকিক নিয়ম	39
20.	ঘনবস্তু ও তল	40
21.	সরলের নিয়ম	41-42

ব্রিজ মেটিরিয়াল ব্যবহার প্রসঙ্গে

- ব্রিজ মেটিরিয়ালটি শিক্ষার্থীদের কাছে একটি 'অ্যাকসিলারেটেড লার্নিং প্যাকেজ' হিসেবে কাজ করবে।
- অতিমারির কারণে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন অনুপস্থিতির জন্য শিখনের ক্ষেত্রে যে ঘাটতি তৈরি হয়ে থাকতে পারে, এই ব্রিজ মেটিরিয়ালটি সেই ঘাটতি পূরণে সহায়ক হবে।
- অন্তত ১০০ দিন ধরে সব শিক্ষার্থীর জন্যই ব্রিজ মেটিরিয়ালটি ব্যবহৃত হবে। প্রয়োজনে, বিশেষ কিছু শিক্ষার্থীর জন্য মেটিরিয়ালটির ব্যবহারের মেয়াদ আরও কিছু দিন বাড়ানো যেতে পারে।
- এই ব্রিজ মেটিরিয়ালটির মূল ফোকাস গত দুটি শিক্ষাবর্ষের দুটি শ্রেণির বিষয়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ শিখন সামর্থ্যের সঙ্গে বর্তমান শিক্ষাবর্ষের বা শ্রেণির সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি ব্রিজ মেটিরিয়ালে অন্তর্ভুক্ত করা।
- বিশেষত একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ক্ষেত্রে এই মেটিরিয়ালটির কিছু অংশ প্রবেশক (foundation study content) হিসেবে কাজ করবে।
- যেহেতু ব্রিজ মেটিরিয়ালটি কাম্য শিখন সামর্থ্যের ভিত্তিতে তৈরি, তাই শিক্ষিকা/শিক্ষকদের এই মেটিরিয়ালটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি সার্বিক ভাবনা যেন ক্রিয়াশীল থাকে।
- প্রয়োজন বুঝে শিক্ষিকা/শিক্ষক এই ব্রিজ মেটিরিয়ালের সঙ্গে পাঠ্য বইকে জুড়ে নিতে পারেন।
- এই ব্রিজ মেটিরিয়ালটি নির্দিষ্ট সিলেবাস প্রস্তাবিত বিষয়ের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হবে।
- এই ব্রিজ মেটিরিয়ালের ওপরেই শিক্ষার্থীদের নিয়মিত মূল্যায়ন চলবে।

চার অঙ্কের সংখ্যা

শিক্ষার্থীরা এই পাঠ থেকে :

- চার অঙ্কের সংখ্যার দল গঠন করতে পারবে।
- চার অঙ্কের সংখ্যাগুলির মধ্যে তুলনা করতে পারবে।
- স্থানীয়মান, প্রকৃতমান বুঝে স্থানীয়মানে বিস্তার করতে পারবে।

টাকা পয়সা গুনি

		শতক	দশক	একক
	এক			১
			১	০
	দুই দশ		২	০
		১	০	০
	দশটি বা একটি			
	তিন একশ দুই দশ	৩	২	০

রঙিন কার্ড দিয়ে সংখ্যা বানাই :

১-এর জন্য ১টি ১ নেবো। ১০টি ১ এর বদলে ১টি ১০ নেবো।

১০টি ১০ এর বদলে ১টি ১০০ নেবো।

	শতক	দশক	একক
১০ ১০ ১০ ১০ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১		৪	৭
১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১ ১ ১ ১			
১০০ ১০০ ১০০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১ ১ ১ ১ ১ ১			
১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১ ১ ১ ১ ১ ১			
১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০			
১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১ ১ ১ ১ ১ ১			
১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১			
১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০	৯	০	০

১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ = ১০০০

১০০০

১০টি ১০০ এর বদলে ১টি ১০০০ নেবো।

এখানে শতকের থেকে একটা ঘর বেশি এই নতুন ঘরের নাম হাজার

	হাজার	শতক	দশক	একক
এক →				১
এক দশ →			১	০
এক একশ →		১	০	০
এক হাজার →	১	০	০	০

কার্ড আঁকি এবং সংখ্যা লিখি :

	সংখ্যা লিখি			
	হা	শ	দ	এ
১০০০ ১০০	১	১	০	০
১০০০ ১০০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০ ১ ১ ১ ১				
১০০০ ১০০০ ১০০০ ১০০ ১০০ ১০ ১০ ১ ১ ১০০০ ১০০০ ১০০০ ১০০ ১০ ১ ১				
	১	০	৯	১
	৩	৭	৫	২

সংখ্যা থেকে নোটে বা কার্ডে ভাঙি

শ	দ	এ
৩	৩	৩

নোটের সংখ্যা (প্রকৃত মান)	নোটের মূল্য (স্থানীয় মান)
৩	৩০০
৩	৩০
৩	৩

৩৩৩ = ৩০০ + ৩০ + ৩

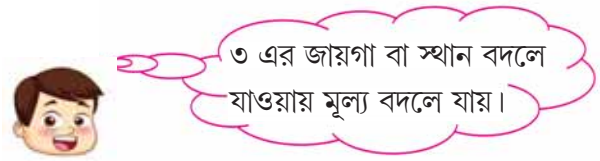

সংখ্যা (হা শ দ এ)	কার্ড আঁকি	কার্ডের সংখ্যা (প্রকৃত মান)	কার্ডের মূল্য (স্থানীয় মান)	স্থানীয় মানে বিস্তার
১ ২ ৩ ৫	১০০০ ১০০ ১০০ ১০ ১০ ১০ ১ ১ ১ ১ ১	১ ২ ৩ ৫	১০০০ ২০০ ৩০ ৫	১০০০+২০০+৩০+৫
২ ৫ ১ ৭				

চার অঙ্কের সংখ্যার যোগ ও বিয়োগ

শিক্ষার্থীরা এই পাঠ থেকে :

- চার অঙ্কের সংখ্যার সঙ্গে দুই অঙ্কের বা তিন অঙ্কের সংখ্যার যোগ বা বিয়োগ করতে পারবে।
- যোগ বা বিয়োগ করতে হবে এমন বাস্তব সমস্যার সমাধান করতে পারবে।

ছবি দেখি গুনে লিখি :

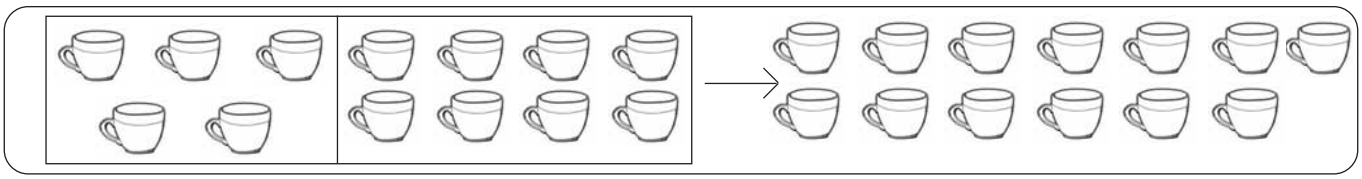

☐ টি কাপ আর ☐ টি কাপ একসঙ্গে মিলে = ☐ টি কাপ

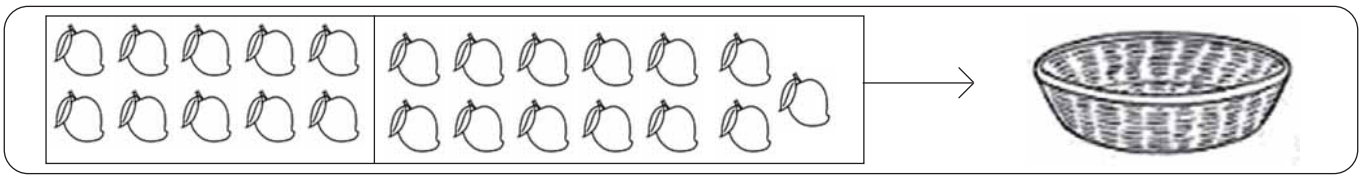

☐ টি আম + ☐ টি আম একসঙ্গে মিলে = ☐ টি আম

কার্ডের সাহায্যে দল বানিয়ে যোগ করি :

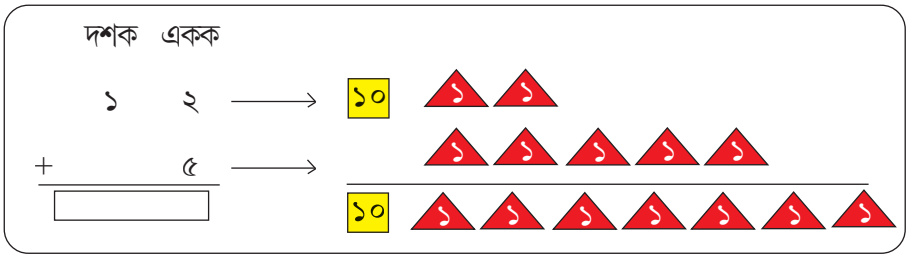

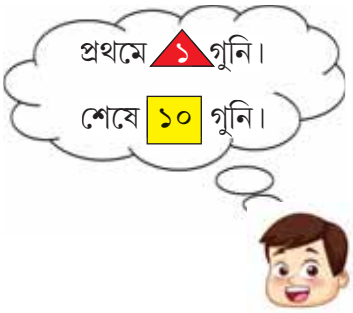

নতুন ১টি ১০ দশকের ঘরে লিখি।

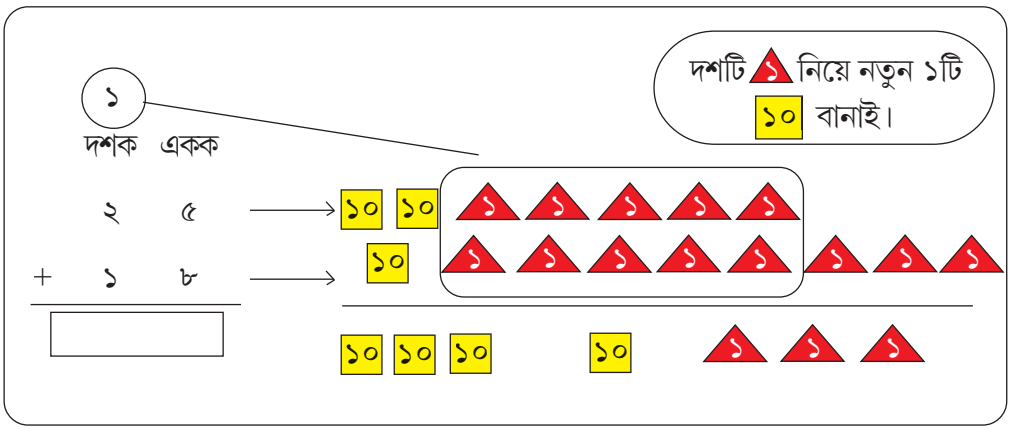

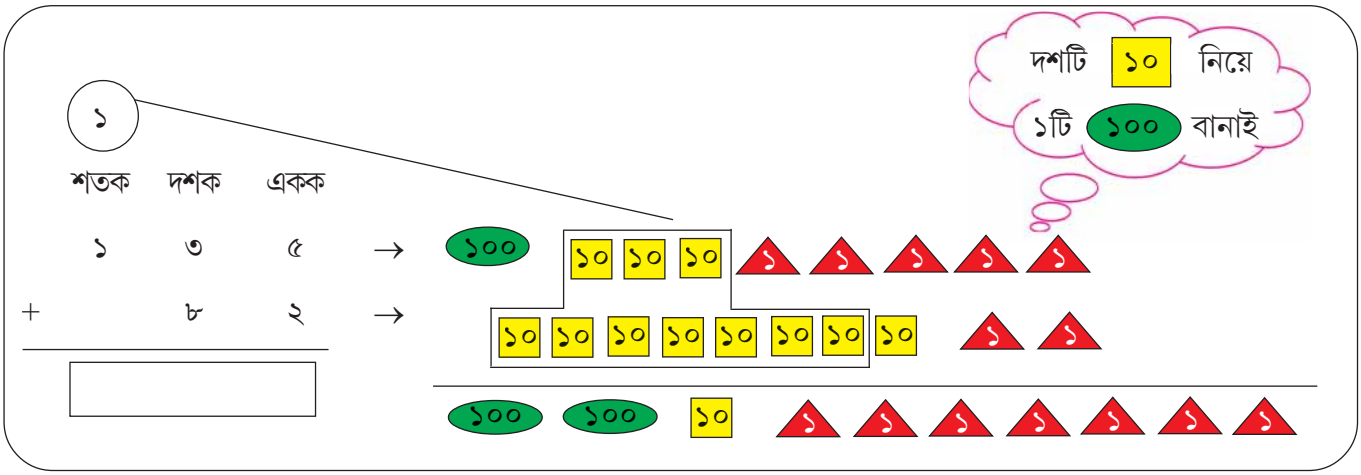

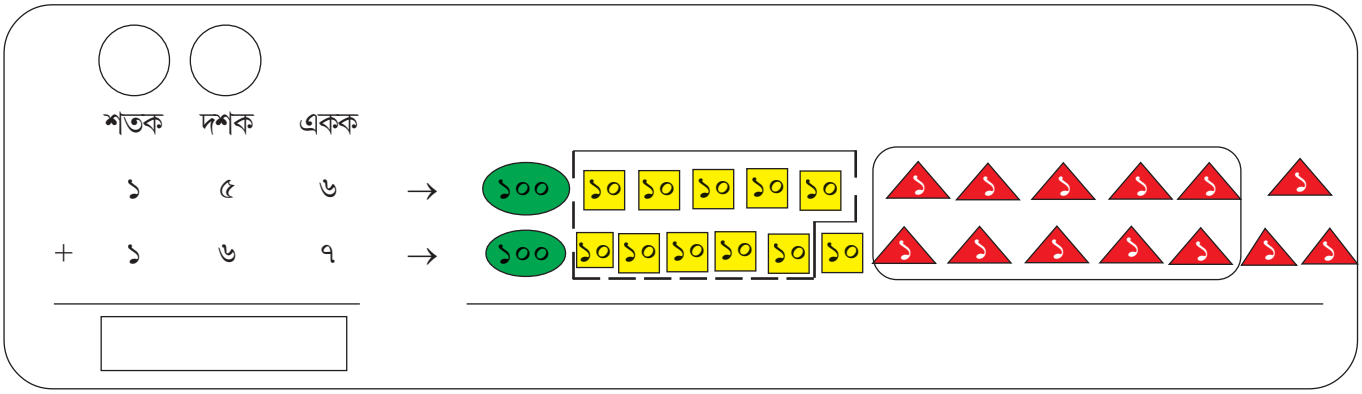

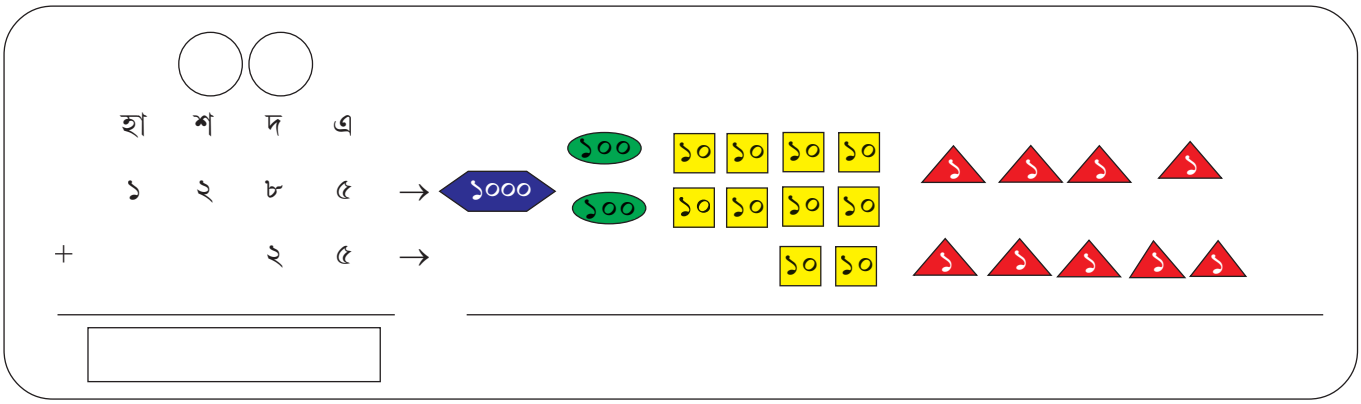

কার্ডের সাহায্য ছাড়া নিজে করি :

	হা	শ	দ	এ
	১	২	৮	৫
		১	৯	০
+			৫	৮

	হা	শ	দ	এ
	৫	৪	২	৭
	১	২	৩	২
+		১	২	৩

	হা	শ	দ	এ
	৩	৬	১	৫
	২	১	২	৩
+		৪	৩	১

কার্ডের সাহায্যে বই কত বেশি / কম হিসেব করি :

রিতার কাছে ২৫টি বই আছে আর মিনির কাছে ১৪টি বই আছে। রিতার কাছে মিনির থেকে বই ☐ (বেশি / কম) আছে।

২৫ থেকে ১৪ সরিয়ে নিয়ে কম / বেশি হিসেব করি।

২৫ – ১৪ = ☐

কার্ডের সাহায্যে বিয়োগ করি:

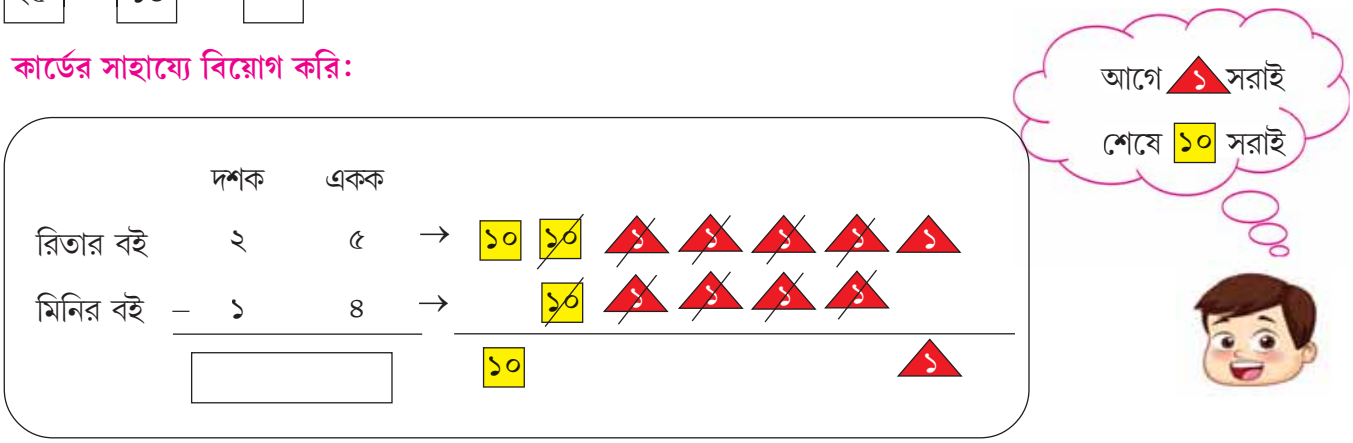

রাজুর কাছে ৩১টি বই আছে। রিতার কাছে রাজুর থেকে বই ☐ (বেশি / কম) আছে।

৩১ থেকে ২৫ সরিয়ে নিয়ে কম / বেশি হিসেব করি।

৩১ – ২৫ = ☐

কার্ডের সাহায্যে বিয়োগ করি:

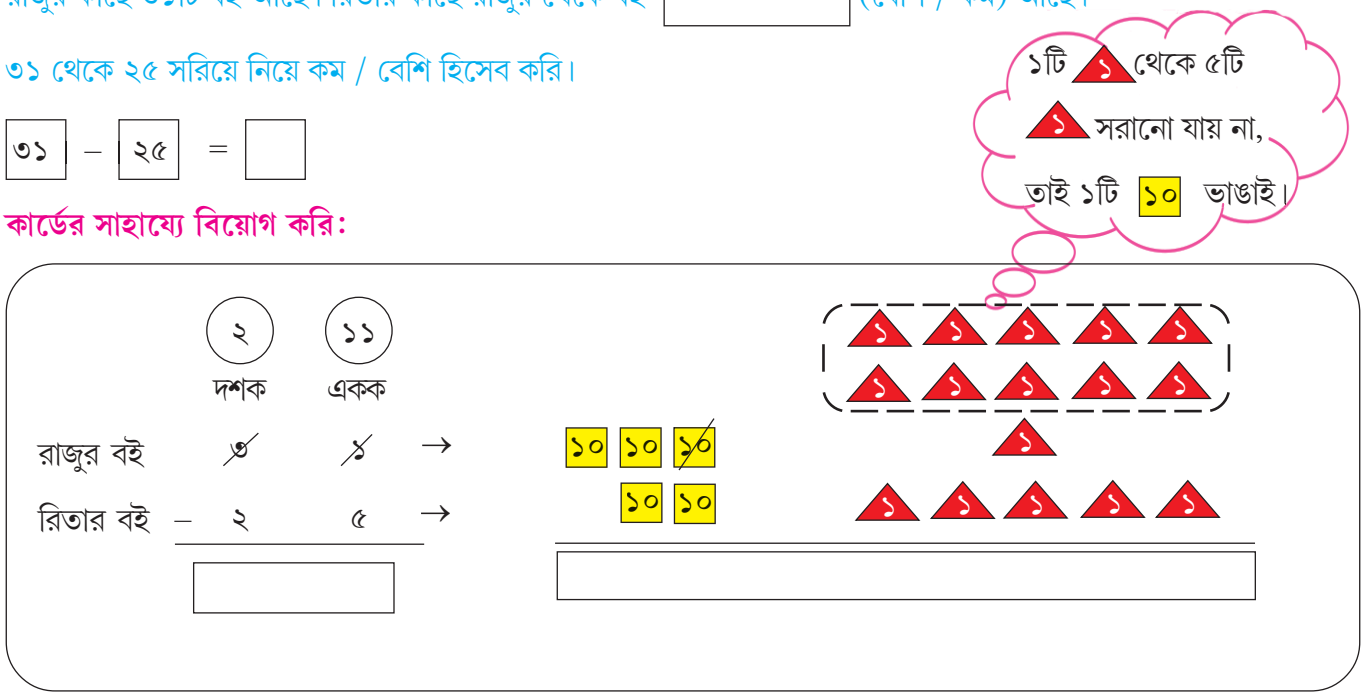

কাজলের কাছে ১২২টি বই আছে। কাজলের কাছে রাজুর থেকে ☐ (বেশি / কম) বই আছে।

১২২ – ☐ = ☐

কার্ডের সাহায্যে বিয়োগ করি :

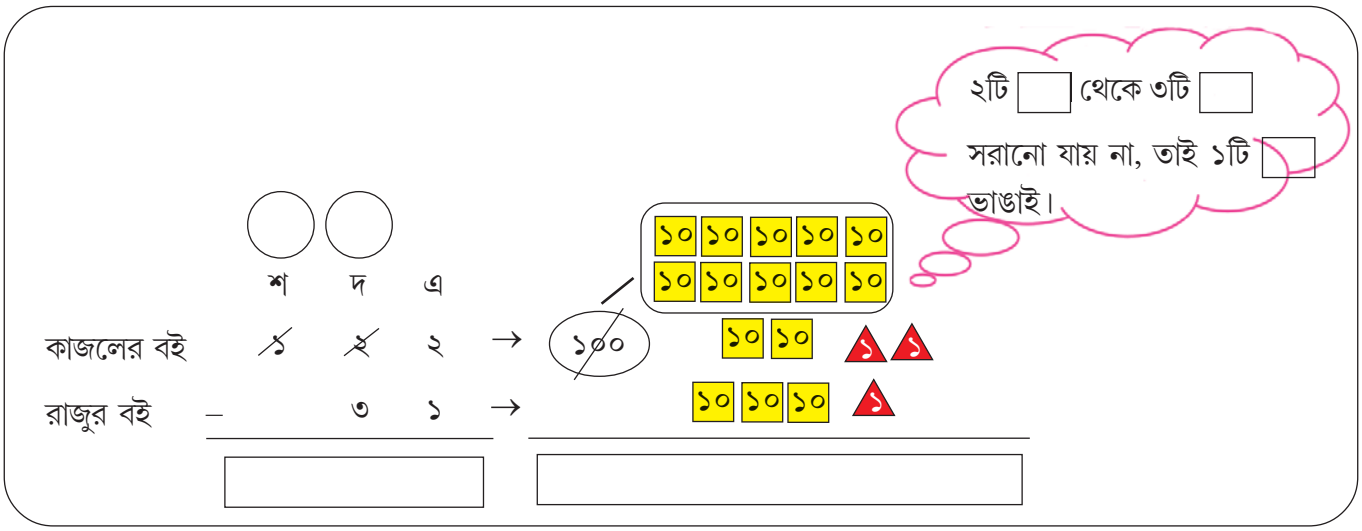

রেশমের কাছে ২১২টি বই আছে। রেশমের কাছে কাজলের থেকে ☐ (বেশি / কম) আছে।

☐ – ☐ = ☐

কার্ডের সাহায্য ছাড়া বিয়োগ করি :

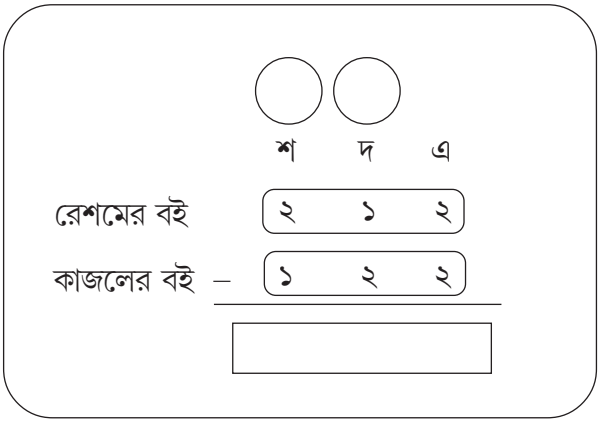

নিজে করি :

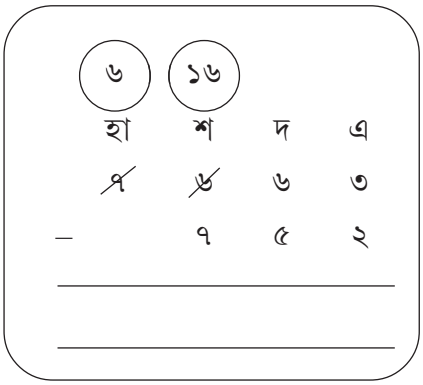

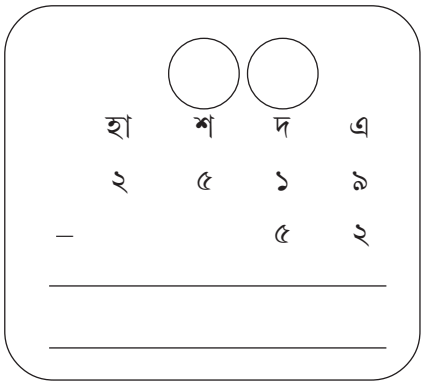

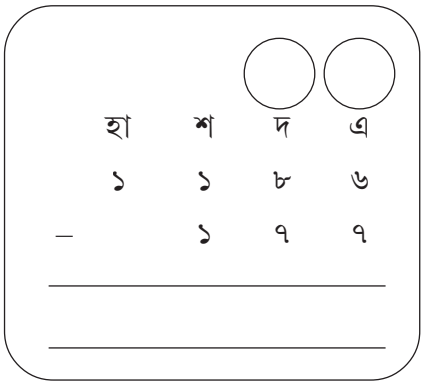

গুণ

শিক্ষার্থীরা এই পাঠ থেকে :

- দুই অঙ্কের বা তিন অঙ্কের সংখ্যাকে এক বা দুই অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে পারবে।
- গুণ্য, গুণক, গুণফল নির্ণয় করতে পারবে।
- গুণের সাহায্যে বাস্তব সমস্যা সমাধান করতে পারবে।

আলাদা আলাদা দল গড়ি

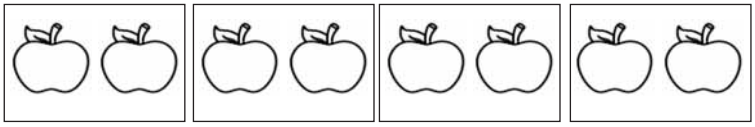

→ ২ × ৪ = ৮

২ + ২ + ২ + ২

গুণ্য গুণক গুণফল

২টি করে ৪টি আপেলের দল।

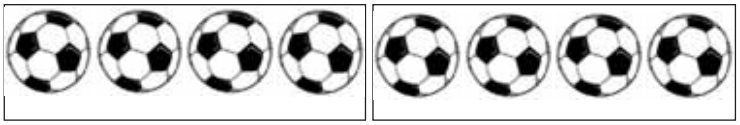

→ ☐ × ☐ = ☐

_____ টি করে _____ টি আপেলের দল। এখানে গুণ্য = _____ গুণক = _____ গুণফল = _____ ।

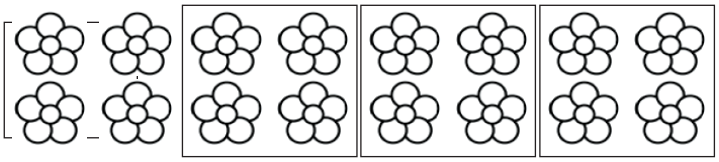

→ ২ × ☐ = ☐

_____ টি করে _____ টি ফুলের দল। এখানে গুণ্য = _____ গুণক = _____ গুণফল = _____ ।

ফাঁক পূরণ করি :

৫ + ৫ + ৫ + ৫ = ☐ → ☐ × ☐ = ☐

৭ + ৭ + ৭ = ☐ → ☐ × ☐ = ☐

২ + ২ + ২ + ২ = ☐ → ☐ × ☐ = ☐

৬ × ২ = ১২ → ☐ + ☐ = ☐

২ × ৫ = ১০ → ☐ + ☐ + ☐ + ☐ + ☐ = ☐

☐ × ☐ = ☐ → ☐ + ☐ = ☐

☐ × ☐ = ☐ → ☐ + ☐ + ☐ + ☐ = ☐

বাজার করি

১২ টাকা

৩টি পেনের দাম

= ১২ টাকা × ৩ = ____ টাকা

১২ কে
১০ + ২-এ
ভেঙে গুণ করি।

১২ = ১০ + ২

	১০	২
৩	১০ × ৩ = ৩০	৩ × ২ = ৬

	দ	এ
	৩	০
+		৬
	৩	৬

১৭ টাকা

৪টি খাতার দাম

= ____ টাকা × ____

= ____ টাকা

	____	____
____	____ × ____ = ____	____ × ____ = ____

	দ	এ
+		

১২৫ টাকা

২টি জামার দাম = ১২৫ টাকা × ২ = ____ টাকা

১২৫ = ১০০ + ২০ + ৫

	১০০	২০	৫
২	১০০ × ২ = ২০০	২০ × ২ = ৪০	৫ × ২ = ১০

	শ	দ	এ
	২	০	০
		৪	০
+		১	০

২১০ টাকা

৪টি চাদরের দাম = ☐ টাকা × ☐ = ☐ টাকা

২১০ = ☐ + ☐ + ☐

☐	২০	৫
☐ × ☐ = ☐	☐ × ☐ = ☐	☐ × ☐ = ☐

শ	দ	এ
+		

৩২৭ টাকা

৩ বস্তা তুলোর দাম = ☐ টাকা × ☐ = ☐ টাকা

৩২৭ = ☐ + ☐ + ☐

☐	☐	☐
☐ × ☐ = ☐	☐ × ☐ = ☐	☐ × ☐ = ☐

শ	দ	এ
+		

১০ টাকা

১২টি বইয়ের দাম

= ১০ টাকা × ১২

= ☐ টাকা

১০

১০		২
১০ × ১০		১০ × ২
১০০		২০

	দ	এ
+		

অন্যভাবে করি :

	শ	দ	এ				
		১	০				
×		১	২	→	১০	+	২
		২	০	←	১০	×	২
+	১	০	০	←	১০	×	১০
	১	২	০				

গুণক ১২ কে ১০ + ২-এ ভেঙে নিই। গুণ্য ১০ কে ২ দিয়ে ও ১০ দিয়ে গুণ করে পরপর বসিয়ে + করি।

নিজে করি :

	শ	দ	এ				
		২	৮				
×		১	৩	→	১০	+	৩
		৭	৪	←	২৮	×	৩
+	☐	☐	☐	←	২৮	×	১০
	☐	☐	☐				

	শ	দ	এ				
		৩	৭				
×		১	৯	→	☐	+	☐
	☐	☐	☐	←	☐	×	☐
+	☐	☐	☐	←	☐	×	☐
	☐	☐	☐				

	শ	দ	এ				
		৪	০				
×		১	১	→	☐	+	☐
	☐	☐	☐	←	☐	×	☐
+	☐	☐	☐	←	☐	×	☐
	☐	☐	☐				

	শ	দ	এ				
		১	৫				
×		১	৬	→	☐	+	☐
	☐	☐	☐	←	☐	×	☐
+	☐	☐	☐	←	☐	×	☐
	☐	☐	☐				

ভাগ

শিক্ষার্থীরা এই পাঠ থেকে :

- তিন অঙ্কের সংখ্যাকে এক অঙ্ক বা দুই অঙ্ক সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে পারবে।
- ভাগ করতে হয় এমন বাস্তব সমস্যা সমাধান করতে পারবে।

সমান ভাগে ভাগ করি

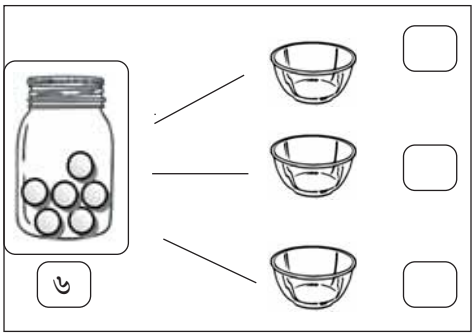

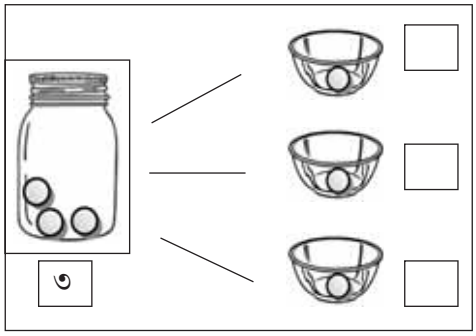

১ টা করে দিলাম।
জারে রইল
৬ – ৩ = ৩

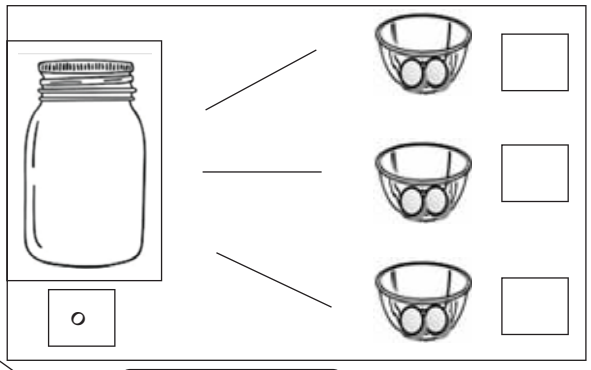

আরও ১ টা করে
দিলাম। জারে রইল
৩ – ৩ = ০

৬
– ৩ → ১ বার
৩
– ৩ → ২ বার
০

৬ ÷ ৩ = ২

একই সংখ্যা বারবার বিয়োগের (–)
বদলে ভাগ (÷) করি

২ - ভাগফল
৬ - ভাজ্য
ভাজক - ৩
– ৬
০ - ভাগশেষ

৩ এর নামতায় পাই
৩ × ২ = ৬

৫ এর নামতার সাহায্যে ৫ টি দলে সমান ভাগ করি :

আমের সংখ্যা	সমান ৫ টি দলে ভাগ		প্রতিটি দলে আম	গুণের নামতা কাজে লাগাই
১০	১০ ÷ ৫	=	২	৫ × ২ = ১০
৩০	৩০ ÷ ৫	=	☐	☐ × ☐ = ☐
২৫	☐ ÷ ☐	=	☐	☐ × ☐ = ☐

ঝুড়ির আম ভাগ করি

৩৫ টি আম ৩ জনের মধ্যে ভাগ করি :

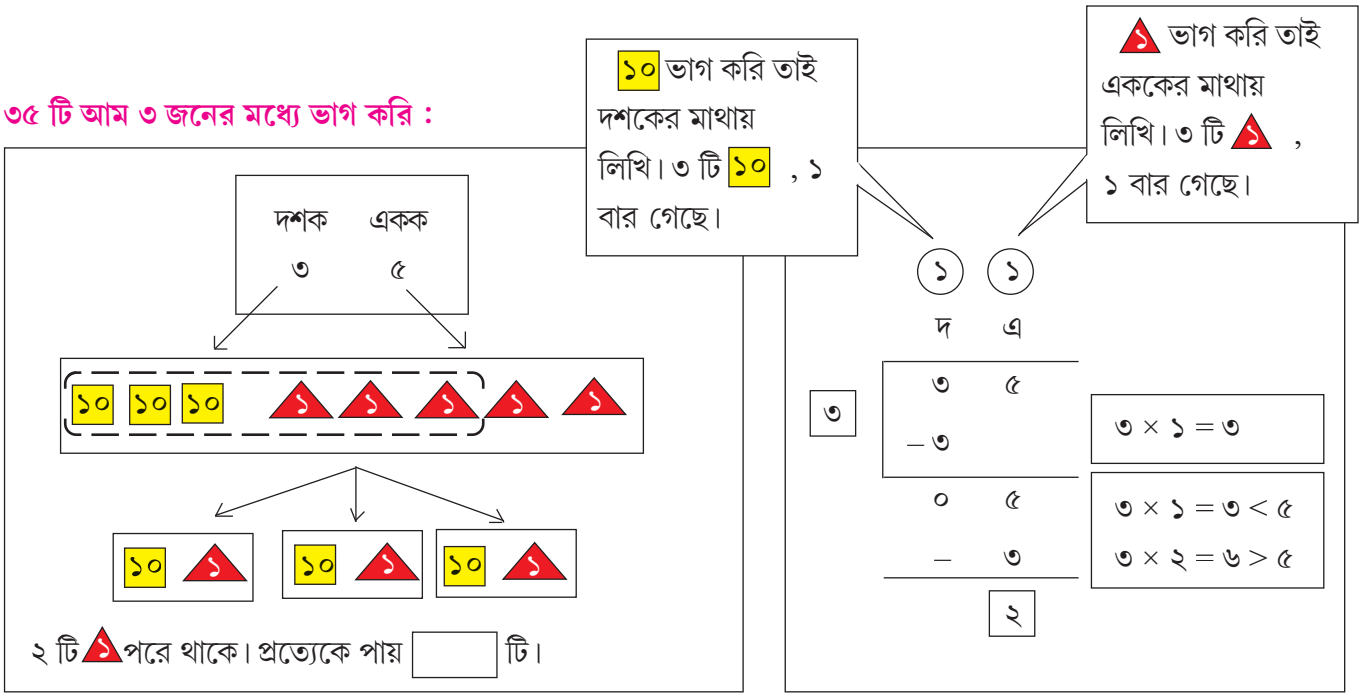

৩৫ টি আম ৪ জনের মধ্যে ভাগ করি :

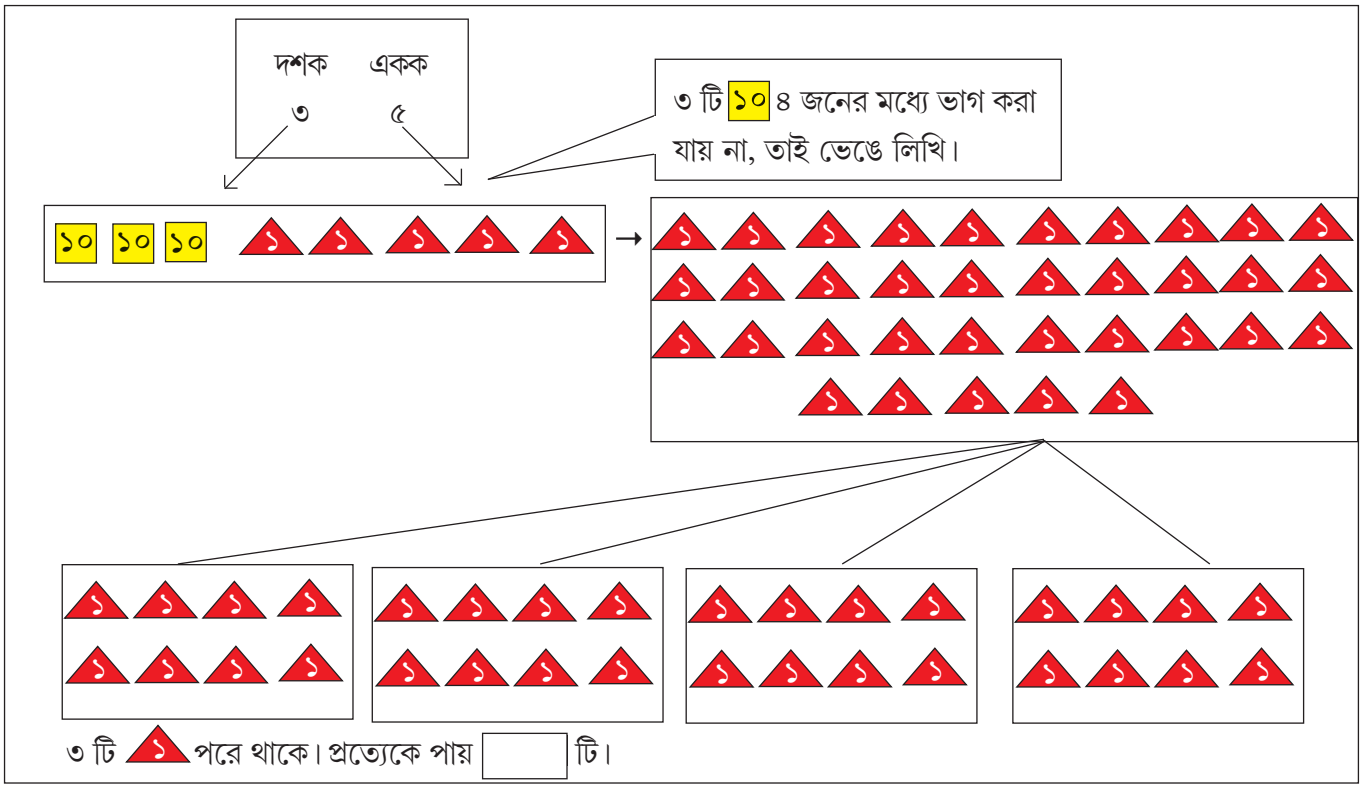

৮

	দ	এ
৪	৩	৫
–	৩	২
	০	৩

৪ × ৮ = ৩২ < ৩৫

৪ × ৯ = ৩৬ > ৩৫

১ ভাগ করি তাই এককের মাথায় লিখি ৪টি ১,৮ বার গেছে।

৩৫ টি আম ২ জনের মধ্যে ভাগ করি:

দশক	একক
৩	৫

১০ ১০ ১০ ১ ১ ১ ১ ১

২ টি ১০ ২ জনের মধ্যে ভাগ করা যায় না, তাই ১টি ১০ ভেঙে লিখি।

→

১০ ১০ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

১০ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

১০ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

১ টি পরে থাকে। প্রত্যেকে পায় ☐ টি।

	(১) দ	(১) এ
২	৩	৫
	– ২	↓
	১	৫
	–১	৪
		১

২ × ১ = ২ < ৩

২ × ২ = ৪ > ৩

২ × ৭ = ১৪ < ১৫

২ × ৮ = ১৬ > ১৫

কার্ড ছাড়া সরাসরি ভাগ করি :

৫৭৫ ÷ ২

২ ☐ ☐

	দ	এ	শ
২	৫	৭	৫
	-৪	↓	
	১	৭	
	- ☐	☐	
		☐	☐
		☐	☐

২ × ☐ = ☐ < ৫

২ × ☐ = ☐ > ৫

২ × ☐ = ☐ < ১৭

২ × ☐ = ☐ > ১৭

২ × ☐ = ☐ <

২ × ☐ = ☐ >

ভাজ্য = ☐ ভাজক = ☐

ভাগফল = ☐ ভাগশেষ = ☐

৩০৬ ÷ ৯

২ ☐ ☐

	শ	দ	এ
৯	৩	০	৬
	- ☐	☐	↓
		☐	☐
	-	☐	☐
			☐

ভাজ্য = ☐ ভাজক = ☐

ভাগফল = ☐ ভাগশেষ = ☐

গুণের নামতা

শিক্ষার্থীরা এই পাঠ থেকে :

- নামতা তৈরি করতে পারবে।

দ	এ
১	২
×	১
১	২

প্রথমে ১ × ২ করে এককে,
পরে ১ × ১ করে দশকে লিখি

দ	এ
১	২
×	২
২	৪

দ	এ
১	২
×	৩
৩	৬

দ	এ
১	২
×	৪
৪	৮

(১)	
দ	এ
১	২
×	৫
৬	০

প্রথমে ৫ × ২= ১০ বা এক দশ তাই, এককে ০।
৫ × ১= ৫ দশকে ৫ দশ + ১ দশ = ৬

(১)	
দ	এ
১	২
×	৬
৭	২

৬ × ২= ১২ বা এক দশ তাই, এককে ২।
৬ × ১= ৬ দশকে ৬ দশ + ১ দশ = ৭

(১)	
দ	এ
১	২
×	৭

(১)	
দ	এ
১	২
×	৮

	( )	
শ	দ	এ
	১	২
×		৯

	( )	
শ	দ	এ
	১	২
×	১	০
১	২	০

গুণ করে পাই :

১২ × ১ = ১২	১২ × ৬ = ৭২	এইভাবে ১১ থেকে ২০ পর্যন্ত নামতা তৈরি করতে পারি।
১২ × ২ = ২৪	১২ × ৭ = ৮৪	
১২ × ৩ = ৩৬	১২ × ৮ = ৯৬	
১২ × ৪ = ৪৮	১২ × ৯ = ১০৮	
১২ × ৫ = ৬০	১২ × ১০ = ১২০	

বছর-মাস-সপ্তাহ-দিন

শিক্ষার্থীরা এই পাঠ থেকে :

- বছরকে মাসে ও মাসকে বছরে বা বছর ও মাসে প্রকাশ করতে পারবে।
- মাসকে দিনে ও দিনকে মাসে বা মাস ও দিনে প্রকাশ করতে পারবে।
- সপ্তাহকে দিনে বা দিনকে সপ্তাহে প্রকাশ করতে পারবে।
- বছর-মাস-দিনের যোগ বিয়োগ করতে পারবে।

ক্যালেন্ডার দেখি

জানুয়ারী

রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহ	শুক্র	শনি
						১
২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯
৩০	৩১					

ফেব্রুয়ারী

রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহ	শুক্র	শনি
		১	২	৩	৪	৫
৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬
২৭	২৮					

মার্চ

রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহ	শুক্র	শনি
		১	২	৩	৪	৫
৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬
২৭	২৮	২৯	৩০	৩১		

এপ্রিল

রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহ	শুক্র	শনি
					১	২
৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০

মে

রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহ	শুক্র	শনি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮
২৯	৩০	৩১				

জুন

রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহ	শুক্র	শনি
			১	২	৩	৪
৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
২৬	২৭	২৮	২৯	৩০		

জুলাই

রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহ	শুক্র	শনি
						১
২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯
৩০	৩১					

অগাস্ট

রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহ	শুক্র	শনি
		১	২	৩	৪	৫
৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬
২৭	২৮	২৯	৩০	৩১		

সেপ্টেম্বর

রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহ	শুক্র	শনি
					১	২
৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০

অক্টোবর

রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহ	শুক্র	শনি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮
২৯	৩০	৩১				

নভেম্বর

রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহ	শুক্র	শনি
			১	২	৩	৪
৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
২৬	২৭	২৮	২৯	৩০		

ডিসেম্বর

রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহ	শুক্র	শনি
				১	২	৩
৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১

১ বছরে [ ] মাস হয়। ইংরেজি বছরের প্রথম মাস [ ]। ১ সপ্তাহে [ ] দিন।

২৮ দিন হয় [ ] মাসে। জুন মাস হয় [ ] দিনে। সেপ্টেম্বর মাস হয় [ ] দিনে।

মাসগুলি কখনো [ ] কখনো [ ] বা কখনো [ ] দিনে হয়।

তাই ১ মাস সমান প্রায় [৩০] দিন ধরতে হয়।

নিজে করি :

[১] মাস = [৩০] দিন

[২] মাস = [ ] × [২] দিন = [ ] দিন

[৪] মাস [১৫] দিন = [ ] × [৪] দিন + [১৫] দিন = [ ] দিন + [ ] দিন = [ ] দিন

৪৫ দিন = ৩০ দিন + ১৫ দিন = ☐ মাস ☐ দিন

৫২ দিন = ☐ দিন + ☐ দিন = ☐ মাস ☐ দিন

৩ সপ্তাহ = ☐ × ৩ দিন = ☐ দিন

৩৫ দিন = ৭ × ☐ দিন = ☐ সপ্তাহ

	২	মাস	১৮	দিন
+	১	মাস	৭	দিন
	☐	মাস	☐	দিন

	৩	মাস	১৪	দিন
–	২	মাস	১২	দিন
	☐	মাস	☐	দিন

	৩	বছর	৬	মাস
–	২	বছর	৪	মাস
	☐	বছর	☐	মাস

	৪	মাস	২৫	দিন	
+	২	মাস	১৮	দিন	
	৬	মাস	৪৩	দিন	
=	৬	মাস	৩০ + ১৩	দিন	
=	৬ + ১	মাস	১৩	দিন	
=	☐	মাস	☐	দিন	

৩০ দিন = ১ মাস নিই।

	৫	মাস	৯	দিন
+	২	মাস	৮	দিন
	☐	মাস	☐	দিন
=	☐	মাস	☐ + ☐	দিন
=	☐ + ☐	মাস	☐	দিন
=	☐	মাস	☐	দিন

	৫	বছর	৯	মাস
+	২	বছর	৮	মাস
	☐	বছর	১৭	মাস
=	☐	বছর	১২ + ৫	মাস
=	☐ + ১	বছর	☐	মাস
=	☐	বছর	☐	মাস

১২ মাস = ১ বছর নিই।

	৬	বছর	৬	মাস
+	৫	বছর	৭	মাস
	☐	বছর	☐	মাস
=	☐	বছর	☐ + ☐	মাস
=	☐ + ☐	বছর	☐	মাস
=	☐	বছর	☐	মাস

	২		৩০ + ৫	
	৩	মাস	৫	দিন
–	১	মাস	২০	দিন
		মাস	১৫	দিন

১ মাস বা ৩০ দিন ধার নিই।

			+	
	৫	মাস	১০	দিন
–	২	মাস	২৫	দিন
		মাস		দিন

	৪		১২ + ২	
	৫	বছর	২	মাস
–	১	বছর	৭	মাস
		বছর		দিন

১ বছর বা ১২ মাস ধার নিই।

			+	
	৭	বছর	৩	মাস
–	২	বছর	৯	মাস
		বছর		মাস

	৩	বছর	৮	মাস	১৫	দিন	
+	২	বছর	৭	মাস	১০	দিন	
		বছর		মাস		দিন	
=		বছর		+		মাস	দিন
=		+		বছর		মাস	দিন
=		বছর		মাস		দিন	

					+	
	৬	বছর	৯	মাস	১৫	দিন
–	৩	বছর	৭	মাস	২০	দিন
		বছর		মাস		দিন

দিন-ঘণ্টা-মিনিট-সেকেন্ড

শিক্ষার্থীরা এই পাঠ থেকে :

- ঘণ্টা, মিনিট, সেকেন্ড-এর মধ্যে পারস্পরিক রূপান্তর করতে পারবে।
- ঘণ্টা-মিনিট-সেকেন্ড-এর যোগ বিয়োগ করতে পারবে।

ঘড়ি দেখি

ঘণ্টার কাঁটা বড়ো ১ ঘর সরলে হয় ১ ঘণ্টা।

মিনিটের কাটা ছোটো ১ ঘর সরলে হয় ১ মিনিট।

সেকেন্ডের কাঁটা ছোটো ১ ঘর সরলে হয় ১ সেকেন্ড।

মিনিটের কাঁটা ছোটো ৬০ ঘর সরলে, ঘণ্টার কাঁটা বড়ো এক ঘর সরে।

১ ঘণ্টা = ৬০ মিনিট

সেকেন্ডের কাঁটা ছোটো ৬০ ঘর সরলে, মিনিটের কাঁটা ছোটো এক ঘর সরে।

১ মিনিট = ৬০ সেকেন্ড

২৪ ঘণ্টা = ১ দিন

সময়ের হিসাব করি :

১ মিনিট = ☐ সেকেন্ড

২ মিনিট = ☐ × ২ সেকেন্ড = ☐ সেকেন্ড

১৮০ সেকেন্ড = ৬০ × ৩ সেকেন্ড = ☐ মিনিট

১২৪ সেকেন্ড = (১২০ + ৪) সেকেন্ড

= ৬০ × ☐ সেকেন্ড + ☐ সেকেন্ড = ☐ মিনিট ☐ সেকেন্ড

১ ঘণ্টা = ☐ মিনিট

৩ ঘণ্টা = ☐ × ☐ মিনিট = ☐ মিনিট

২ ঘণ্টা ২৫ মিনিট = ৬০ × ২ মিনিট + ☐ মিনিট

= ☐ মিনিট + ☐ মিনিট = ☐ মিনিট

৯০ মিনিট = (৬০ + ৩০) মিনিট = ☐ ঘণ্টা ☐ মিনিট

২৪ ঘণ্টা = ☐ দিন

৪৮ ঘণ্টা = ২৪ ঘণ্টা + ২৪ ঘণ্টা = ☐ দিন

১ দিন ১২ ঘণ্টা = ☐ ঘণ্টা + ☐ ঘণ্টা = ☐ ঘণ্টা

	১	ঘণ্টা	৪৫	মিনিট
+	১	ঘণ্টা	৩০	মিনিট
	☐	ঘণ্টা	৭৫	মিনিট
=	☐	ঘণ্টা	৬০ + ১৫	মিনিট
=	☐ + ১	ঘণ্টা	১৫	মিনিট
=	☐	ঘণ্টা	☐	মিনিট

৬০ মিনিট = ১ ঘণ্টা নিই।

	৪	ঘণ্টা	২৮	মিনিট
+	২	ঘণ্টা	৩৫	মিনিট
	☐	ঘণ্টা	☐	মিনিট
=	☐	ঘণ্টা	☐ + ☐	মিনিট
=	☐ + ☐	ঘণ্টা	☐	মিনিট
=	☐	ঘণ্টা	☐	মিনিট

	৪		৬০ + ২০	
	৫	ঘণ্টা	২০	মিনিট
–	১	ঘণ্টা	৫০	মিনিট
	☐	ঘণ্টা	৩০	মিনিট

১ ঘণ্টা বা ৬০ মিনিট ধার নিই।

	○		+	
	৭	ঘণ্টা	১২	মিনিট
–	৩	ঘণ্টা	৩০	মিনিট
	☐	ঘণ্টা	☐	মিনিট

ভগ্নাংশ

শিক্ষার্থীরা এই পাঠ থেকে :

- লব ও হর বুঝে ভগ্নাংশ লিখতে পারবে।
- একই হর বিশিষ্ট অথবা একই লব বিশিষ্ট ভগ্নাংশের তুলনা করতে পারবে।
- একই হর বিশিষ্ট ভগ্নাংশের যোগ-বিয়োগ করতে পারবে।

আপেল কাটি

একটি গোটা বা $\boxed{\text{সম্পূর্ণ}}$ আপেল।

আপেলের সমান ২ ভাগ।

আপেলের সমান ২ ভাগের ১ ভাগ। একে ছোটো করে লিখি $\frac{১}{২}$।

এখানে গোটা আপেলের অংশ হল $\frac{১}{২}$। এটা ভাঙা অংশ বা ভগ্নাংশ। $\frac{১}{২}$-এর ১ লব ও ২ হর।

আপেলের সমান ৪ ভাগ।

আপেলের সমান ৪ ভাগের ১ ভাগ = $\frac{১}{৪}$ অংশ, এর লব ১, হর ৪।

আপেলের সমান ৪ ভাগের ২ ভাগ = $\frac{১}{২}$ অংশ, এর লব $\square$, হর $\square$

আপেলের সমান ৪ ভাগের $\square$ ভাগ = $\frac{\square}{\square}$ অংশ

আপেলের সমান ৪ ভাগের ৪ ভাগ = $\frac{৪}{৪}$ অংশ = ১ বা $\boxed{\text{সম্পূর্ণ}}$

নিজে করি :

ছবি দেখি	রং করা অংশ লিখি	লব	হর
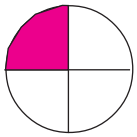	সমান ☐ ভাগের ☐ ভাগ = $\frac{১}{৪}$ অংশ	১	৪
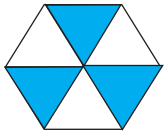	সমান ☐ ভাগের ☐ ভাগ = $\frac{☐}{☐}$ অংশ	☐	☐

কাগজগুলি একই আকারের।

কাগজের রং দেখে কম বেশি খুঁজি

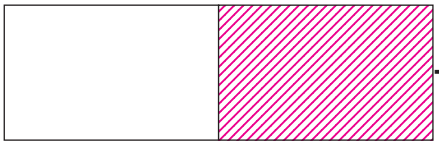

$\frac{১}{২}$

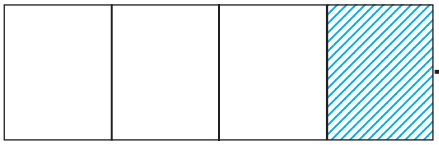

$\frac{☐}{☐}$

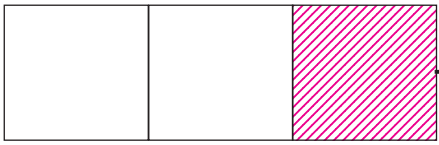

$\frac{☐}{☐}$

ফাঁকা ঘরে > বা < বসাই—

$\frac{১}{২}$ ☐ $\frac{১}{৩}$ $\frac{১}{৪}$ ☐ $\frac{১}{২}$ $\frac{১}{৩}$ ☐ $\frac{১}{৪}$

ভগ্নাংশের লব একই রেখে হর বাড়ালে ভগ্নাংশের মান ছোটো হয়।

$\frac{১}{৮}$

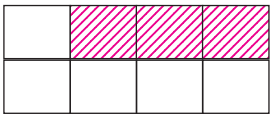

$\frac{☐}{☐}$

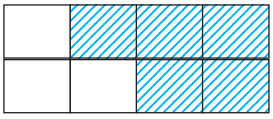

$\frac{☐}{☐}$

ছবি দেখে ফাঁকা ঘরে > বা < বসাই :

$\frac{১}{৮}$ ☐ $\frac{৩}{৮}$ $\frac{৩}{৮}$ ☐ $\frac{৫}{৮}$ $\frac{১}{৮}$ ☐ $\frac{৫}{৮}$

ভগ্নাংশের হর একই রেখে লব বাড়ালে ভগ্নাংশের মান বড়ো হয়।

ফাঁকা ঘরে > বা < বসাই :

$\frac{১}{৫}$ ☐ $\frac{১}{৬}$ $\frac{৬}{৮}$ ☐ $\frac{৬}{৫}$ $\frac{৩}{১৭}$ ☐ $\frac{৩}{১১}$ $\frac{১}{১৯}$ ☐ $\frac{১}{২০}$

$\frac{৫}{১০}$ ☐ $\frac{৭}{১০}$ $\frac{৯}{২৭}$ ☐ $\frac{৩}{২৭}$ $\frac{১৯}{৩৫}$ ☐ $\frac{২১}{৩৫}$ $\frac{১১}{১২}$ ☐ $\frac{৩}{১২}$

কতটা রং করলাম দেখি

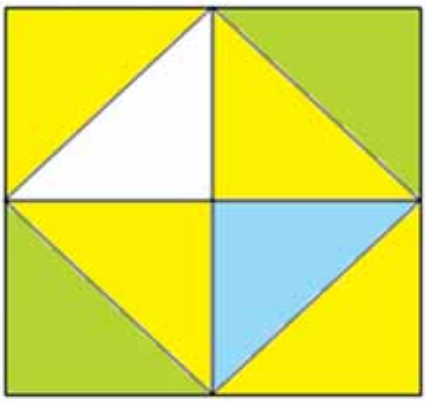

কাগজকে সমান ☐ ভাগ করা হয়েছে।

নীল রং সমান ৮ ভাগের ১ ভাগ = $\frac{\square}{\square}$ অংশ

হলুদ রং সমান ☐ ভাগের ☐ ভাগ = $\frac{\square}{\square}$ অংশ

সবুজ রং সমান ☐ ভাগের ☐ ভাগ = $\frac{\square}{\square}$ অংশ

নীল রং ও হলুদ রং মিলে রং করা হয়েছে—

$\frac{১}{৮} + \frac{১}{৮}$ অংশ

$= \frac{১ + ৪}{৮}$ অংশ

$= \frac{৫}{৮}$ অংশ

হরগুলি সমান

সবুজ রং-এর থেকে হলুদ রং বেশি করা হয়েছে—

$\frac{৪}{৮} - \frac{২}{৮}$ অংশ

$= \frac{৪ - ২}{৮}$ অংশ

$= \frac{২}{৮}$ অংশ

নিজে করি :

$\frac{৩}{১১} + \frac{৫}{১১}$

$= \frac{\square + \square}{১১}$

$= \frac{\square}{\square}$

$\frac{৩}{১১} + \frac{৫}{১১}$

$= \frac{\square + \square}{১১}$

$= \frac{\square}{\square}$

$\frac{৩}{১১} + \frac{৫}{১১}$

$= \frac{\square + \square}{১১}$

$= \frac{\square}{\square}$

$১ - \frac{২}{৭}$

$= \frac{৭}{৭} - \frac{২}{৭}$

$= \frac{৭ - ২}{৭}$

$= \frac{৫}{৭}$

$\frac{২}{৭}$ দেখে $১ = \frac{৭}{৭}$ করি

$১ - \frac{৮}{১৫}$

$= \frac{\square}{\square} - \frac{\square}{\square}$

$= \frac{\square - \square}{\square}$

$= \frac{\square}{\square}$

দৈর্ঘ্যের পরিমাপ

শিক্ষার্থীরা এই পাঠ থেকে :

- স্কেল দিয়ে দৈর্ঘ্য পরিমাপ করতে পারবে।
- দৈর্ঘ্যের বিভিন্ন এককগুলির মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবে।

স্কেল দিয়ে মাপি

কোন পেন্সিলটি লম্বা খুঁজি

লাল পেন্সিল লম্বা, হলুদ পেন্সিল খাটো। এই [লম্বা] বা [দৈর্ঘ্য] মাপি [স্কেল] দিয়ে।

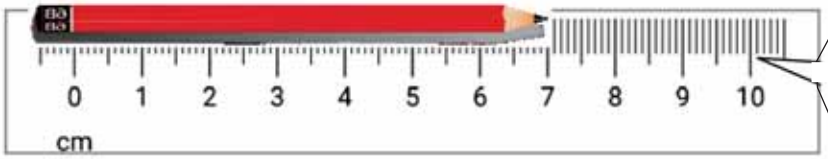

স্কেলের বড়ো দাগগুলি সেন্টিমিটার মাপ।
০, ১, ২, ... এইভাবে দাগ কাটা।

'০' থেকে গোনা শুরু করে পাই লাল পেনসিলের দৈর্ঘ্য [ ] সেন্টিমিটার বা সেমি.।
দুটি বড়ো দাগের মাঝের দৈর্ঘ্য [১ সেন্টিমিটার।]

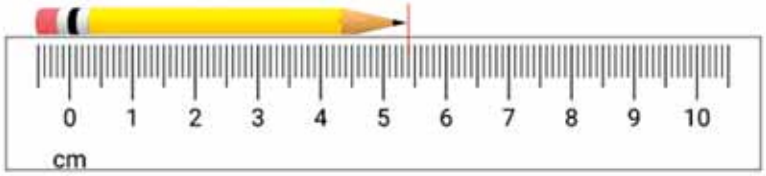

'০' থেকে গোনা শুরু করে পাই হলুদ পেনসিলের দৈর্ঘ্য [ ] সেন্টিমিটার থেকে বেশি কিন্তু [ ] সেন্টিমিটার থেকে কম। হলুদ পেনসিলের শেষটি দুটি বড়ো দাগের মাঝের ছোট দাগের সাথে মিশেছে।

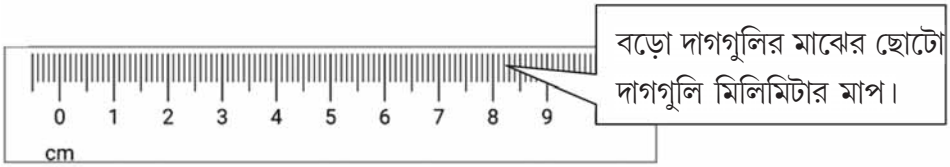

বড়ো দাগগুলির মাঝের ছোটো দাগগুলি মিলিমিটার মাপ।

হলুদ পেনসিলের শেষটি [৫] সেন্টিমিটারের পর ছোটো [৪] টি দাগে গিয়ে মিশেছে। হলুদ পেনসিলের দৈর্ঘ্য [ ] সেন্টিমিটার [ ] মিলিমিটার। দুটি ছোট দাগের মাঝের দৈর্ঘ্য [১ মিলিমিটার] বা মিলিমি.।

তাহলে ৫ সেমি. ৪ মিলিমি. = ৫ × ১০ মিলিমি. + ৪ মিলিমি.

= ৫০ মিলিমি. + [ ] মিলিমি. = [ ] মিলিমি,

দুটি বড়ো দাগের মাঝের দৈর্ঘ্য ১০ ভাগ করা।

[১ সেন্টিমিটার = ১০ মিলিমিটার]

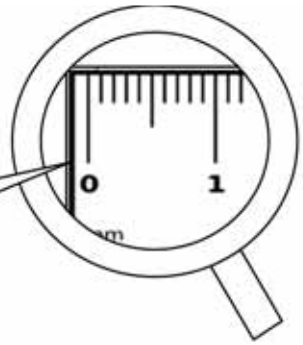

স্কুলের দেওয়ালে সেন্টিমিটারের বড়ো স্কেল আঁকা।

কার উচ্চতা কত মেপে দেখি।

রানার উচ্চতা ☐ সেন্টিমিটার।

মিতিনের উচ্চতা ☐ সেন্টিমিটার।

রিনির উচ্চতা ☐ সেন্টিমিটার।

বড়ো দৈর্ঘ্য মাপতে মিটার লাগে।

১ মিটার = ১০০ সেন্টিমিটার।

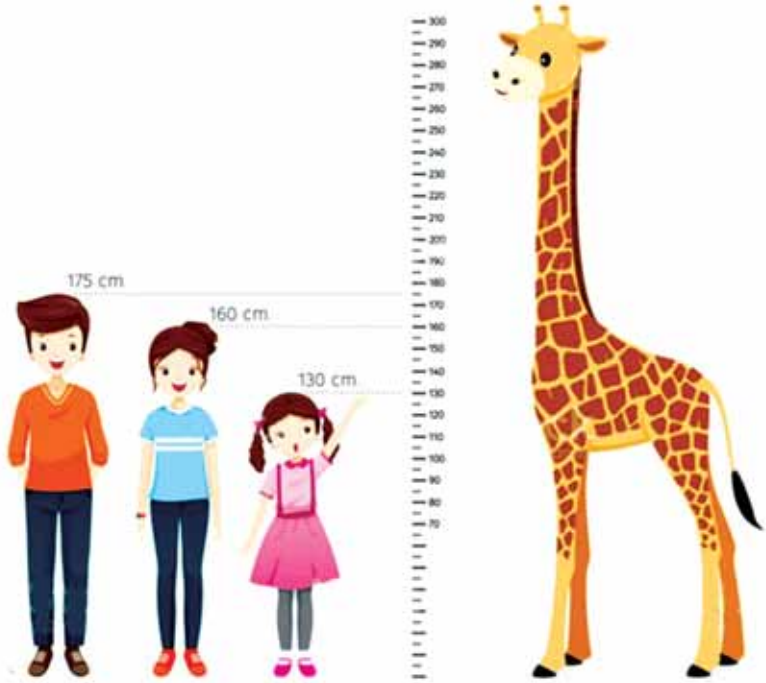

রানা মিতিন রিনি

রানার উচ্চতা = ১৭৫ সেমি = ১০০ সেমি. + ৭৫ সেমি. = ১ মিটার ৭৫ সেমি.

এক জায়গা থেকে আরেক জায়গার লম্বা দূরত্ব মাপতে কিলোমিটার বা কি.মি. লাগে।

বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব ২ কি.মি. = ১০০০ × ২ মিটার = ২০০০ মিটার।

নিজে করি :

৩ কিমি. ৬৯ মি. = কত মি. ?

৩ কিমি. + ৬৯ মি.

= ☐ × ☐ মি. + ৬৯ মি.

= ☐ মি. + ৬৯ মি.

= ☐ মিটার

২৫০০ মি. = কত কিমি. কত মি. ?

২০০০ মি. + ৫০০ মি.

= (২ × ১০০০) মি. + ☐ মি.

= ☐ কিমি. + ☐ মি.

= ☐ কিমি. ☐ মি.

ভরের পরিমাপ

শিক্ষার্থীরা এই পাঠ থেকে :

- ¦þöîî !î!¦þ§ ~„þ„þ†!œî >ö•Ä ¢Á™„þ !˜'ë „þîö“þ þ™yîöîÐ

ওজন করি

”y!vþþ™yÍy xyî îyÝþ...yîy !”öë ö”y„þy˜”yî ç<˜ „þöîÐ

ö„þy˜ !<!˜¢ „þ“þ ¦þy!î “þy @ìy> îy !„þöœy@ìy> !”öë >yþ™y £ëÐ

ö”v„þv˜”vî @ìv> îv !„þöœv@ìv> îvÝþ...vîv !”öë !<!˜¢ „þ“þ ¦þvî# “þv >vöþ™˜Ð

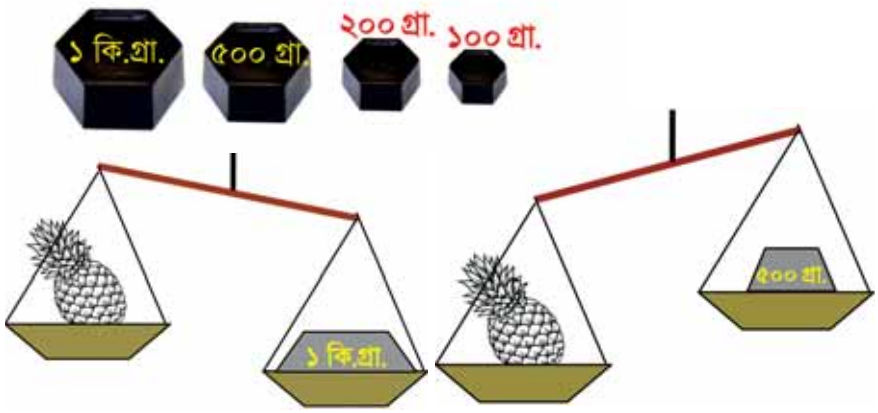

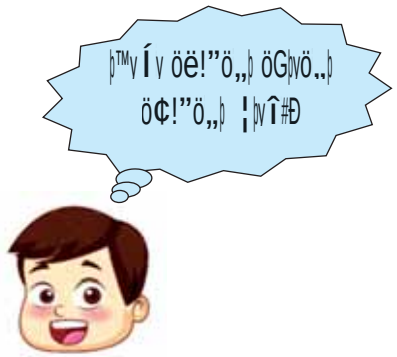

ö”ö... î!Gþ ¦öî 1 !„þ.@ìy. ☐ 500 @ìv. S>/< î¢y£V

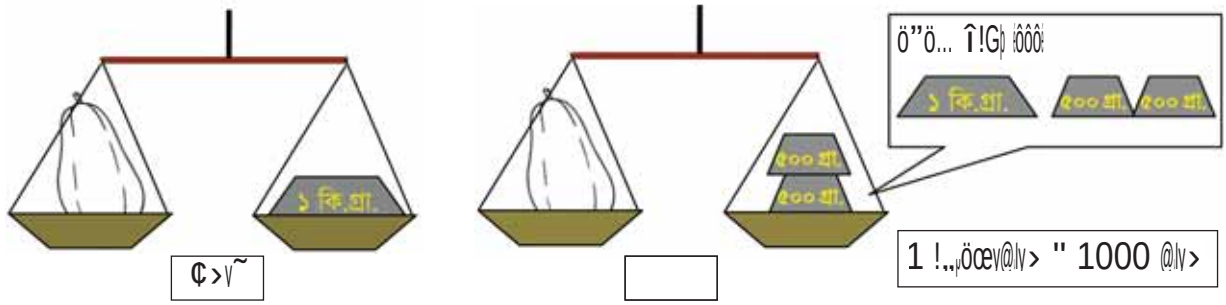

¢>v˜ ☐ 1 !„þöœv@ìv> " 1000 @ìv>

নিজে করি :

3 !„þ.@ìv. " „þ“þ @ìv>Ú

3 !„þ.@ìy. " S☐ ' 1000v @ìy> " ☐ @ìv>Ú

3 !„þ.@ìy. 250 @ìy> " „þ“þ @ìy>Ú

2 !„þ.@ìy. ` 250 @ìy>

" S2 ' 1000v @ìy> ` 250 @ìy>

" ☐ @ìy> ` 250 @ìy>

" ☐ @ìv>

5000 @ìv> " „þ“þ !„þ.@ìv.U

3 !„þ.@ìy. " S☐ ' 1000v @ìy> " ☐ @ìv>U

4375 @ìy> " „þ“þ !„þ.@ìy. „þ“þ @ìy>Ú

4000 @ìv> ` 375 @ìv>

" S☐ ' 1000v @ìy> ` ☐ @ìv>

☐ !„þ.@ìv. ` ☐ @ìv>

☐ !„þ.@ìv. ☐ @ìv>

আয়তনের পরিমাপ

শিক্ষার্থীরা এই পাঠ থেকে :

- আয়তনের বিভিন্ন এককগুলির মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবে।

জল মাপি

জল, তেল, দুধ এরকম তরল জিনিস কতটা জায়গা জুড়ে থাকে তা লিটার, মিলিলিটার দিয়ে মাপা হয়। খাবার জলের বিভিন্ন বোতলে লিটার বা মিলিলিটার দিয়ে মাপ থাকে।

জল সমান মাপের পাত্রে ঢেলে বুঝি —

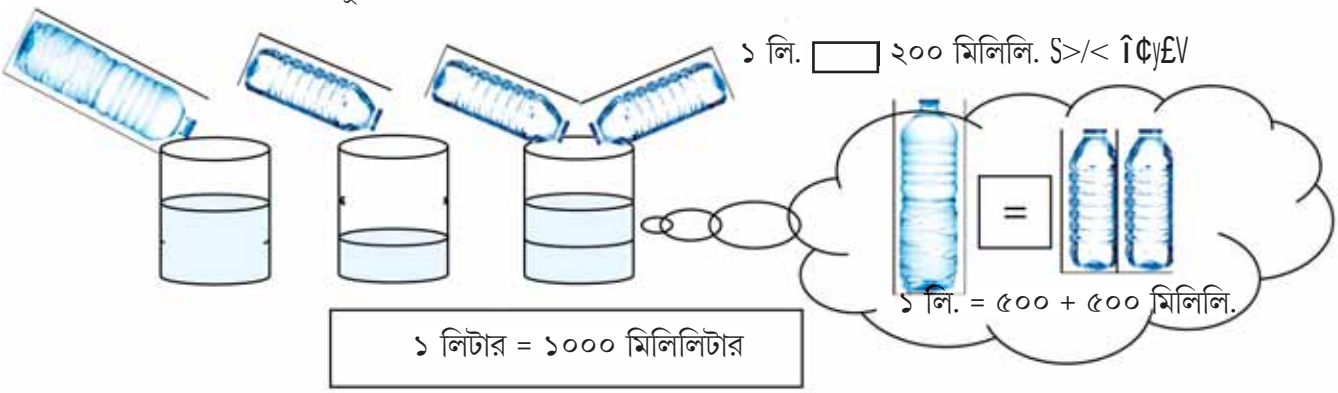

নিজে করি :

4 !œÝþvî " „þ“þ !>!œ!œ.U

4 !œÝþvî " S☐ ' 1000V !>!œ!œ. " ☐ !>!œ!œ.

2 !œ. 250 @ly> " „þ“þ !>!œ!œ.U

2 !œ. ` 250 !>!œ!œ.

" S2 ' 1000V !>!œ!œ. ` 250 !>!œ!œ.

" ☐ !>!œ!œ. ` 250 !>!œ!œ.

" ☐ !>!œ!œ.

3000 !>!œ!œ. " „þ“þ !œÝþvî

3000 !>!œ!œ. " S☐ ' 1000V !>!œ!œ. " ☐

1750 !>!œ!œ. " „þ“þ !œ. „þ“þ !>!œ!œ.U

☐ !>!œ!œ. ` 750 !>!œ!œ.

" S☐ ' 1000V !>!œ!œ. ` ☐ !>!œ!œ.

☐ !œ. ` ☐ !>!œ!œ.

☐ !œ. ☐ !>!œ!œ.

দশমিক ভগ্নাংশ

শিক্ষার্থীরা এই পাঠ থেকে :

- মিলিমিটার থেকে সেন্টিমিটারে ও দশমিক ভগ্নাংশে পরিবর্তন করতে পারবে।
  সামান্য ভগ্নাংশ ও দশমিক ভগ্নাংশের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবে।
  সামান্য ভগ্নাংশ ও দশমিক ভগ্নাংশের রূপান্তর করতে পারবে।

মিলিমিটার কে সেন্টিমিটারের ভগ্নাংশে লিখি

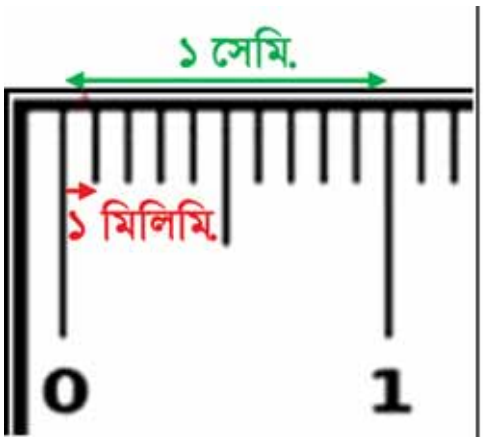

১ মিলিমি. এক সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের সমান ১০ ভাগের ১ ভাগ

এক সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের $\frac{১}{১০}$ অংশ

$\frac{১}{১০}$ সেন্টিমিটার

$\frac{১}{১০}$ কে অন্যভাবে লেখা হয় .১।

.১ -কে বলা হয় ১ দশমাংশ বা দশমিক এক।

$\frac{১}{১০}$ কে বলে সামান্য ভগ্নাংশ। .১ -কে বলে দশমিক ভগ্নাংশ।

তাহলে $\frac{১}{১০}$.১ এবং ১ মিলিমি. .১ সেন্টিমিটার

ফাঁক পূরণ করি :

দৈর্ঘ্য	১ সেন্টিমিটারের সমান ১০ ভাগের কত ভাগ	সামান্য ভগ্নাংশ	দশমিক ভগ্নাংশ
২ মিলিমি.	১ সেন্টিমি. এর সমান ১০ ভাগের ২ ভাগ	$\frac{২}{১০}$	.২ সেন্টিমি.
৮ মিলিমি.	১ সেন্টিমি. এর সমান ১০ ভাগের ☐ ভাগ	$\frac{☐}{১০}$	☐ সেন্টিমি.
৬ মিলিমি.	১ সেন্টিমি. এর সমান ☐ ভাগের ☐ ভাগ	$\frac{☐}{☐}$	☐ সেন্টিমি.

ছবি দেখি	সমান কত ভাগের কত ভাগ	সামান্য ভগ্নাংশ	দশমিক ভগ্নাংশ
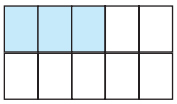	সমান ১০ ভাগের ৩ ভাগ	$\frac{৩}{১০}$	☐
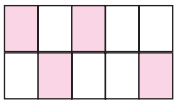	সমান ☐ ভাগের ☐ ভাগ	$\frac{☐}{☐}$	☐

গুণিতক

শিক্ষার্থীরা এই পাঠ থেকে :

- গুণিতক নির্ণয় করতে পারবে।
- দুটি বা তিনটি সংখ্যার সাধারণ গুণিতক নির্ণয় করতে পারবে।
- লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক বা ল.সা.গু. নির্ণয় করতে পারবে।

লজেন্স ভাগ করি

জার থেকে লজেন্স নিয়ে ৪টি গ্লাসে একই সংখ্যার লজেন্স রাখি।

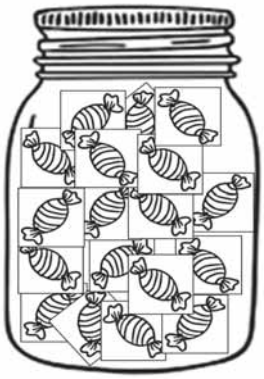

১ + ১ + ১ + ১ = ৪ × ১ = ৪

২ + ২ + ২ + ২ = ৪ × ২ = ৮

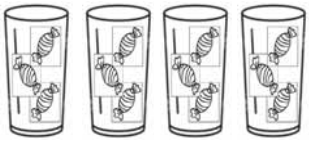

৩ + ৩ + ৩ + ৩ = ৪ × ৩ = ১২

৪ + ৪ + ৪ + ৪ = ৪ × ৪ = ১৬

৪টি গ্লাসে সমান সংখ্যার লজেন্স লাগবে – ৪, ৮, ১২, ১৬, ...।

৪, ৮, ১২, ১৬, ...কে ৪ এর গুণিতক বলে।

এই সংখ্যাগুলি ৪ এর নামতায় আসে।

এরকম ৬টি গ্লাসে সমান সংখ্যার লজেন্স রাখতে মোট লজেন্স লাগবে–

৬ এর গুণিতক → ৬ ১২ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ .....

৬ এর নামতায় আসে।

৪টি গ্লাসে সমান সংখ্যার লজেন্স রাখতে মোট লজেন্স লাগবে :

৪, ৮, ১২, ১৬, (২৪), ২৮, ৩২, (৩৬), ৪০, ৪৪, (৪৮) .....।

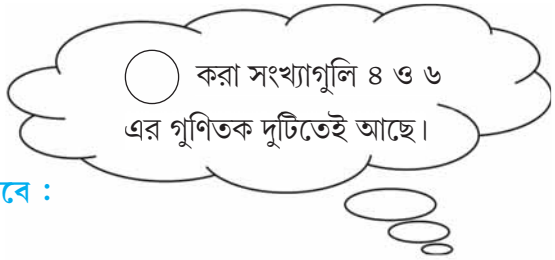

একইভাবে ৬টি প্লেটে সমান সংখ্যার লজেন্স রাখতে মোট লজেন্স লাগবে :

৬, (১২), ১৮, (২৪), ৩০, (৩৬), ৪২, (৪৮), ৫৪, ৬০, ৬৬.....।

৪টি গ্লাসে বা ৬টি বাটিতে সমান সংখ্যার লজেন্স রাখতে মোট লজেন্স লাগবে :

১২, ২৪, ☐, ☐, ...টি।

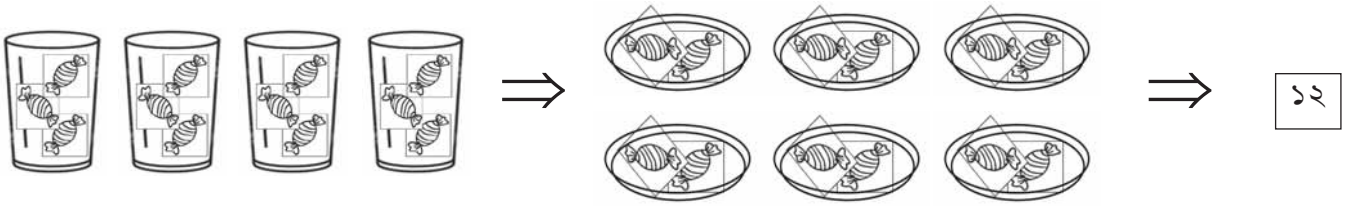

১২, ২৪, ৩৬, ... এদের বলে ৪ ও ৬ এর **সাধারণ গুণিতক**।

৪টি গ্লাসে বা ৬টি বাটিতে সমান সংখ্যার লজেন্স রাখতে সবচেয়ে কম লজেন্স লাগবে **১২** টি।

তাই ১২ হল ৪ ও ৬ এর **লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক বা ল.সা.গু.**।

নিজে করি :

৫ এর গুণিতক → ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

১০ এর গুণিতক → ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

৫ ও ১০ এর সাধারণ গুণিতক → ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ .....

৫ ও ১০ এর লঘিষ্ঠ বা সবথেকে ছোটো সাধারণ গুণিতক → ☐

৪ এর গুণিতক → ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

৬ এর গুণিতক → ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

৮ এর গুণিতক → ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

৪ ৬ ও ৮ এর সাধারণ গুণিতক → ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ .....

৪ ৬ ও ৮ এর লঘিষ্ঠ বা সবথেকে ছোটো সাধারণ গুণিতক → ☐

গুণনীয়ক

শিক্ষার্থীরা এই পাঠ থেকে :

- গুণনীয়ক নির্ণয় করতে পারবে।
- দুটি বা তিনটি সংখ্যার সাধারণ গুণনীয়ক নির্ণয় করতে পারবে।
- গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক বা গ.সা.গু. নির্ণয় করতে পারবে।

ফুলদানিতে ফুল রাখি

৬টি গোলাপ কতগুলি ফুলদানিতে সমান সংখ্যায় রাখতে পারি খুঁজে দেখি।

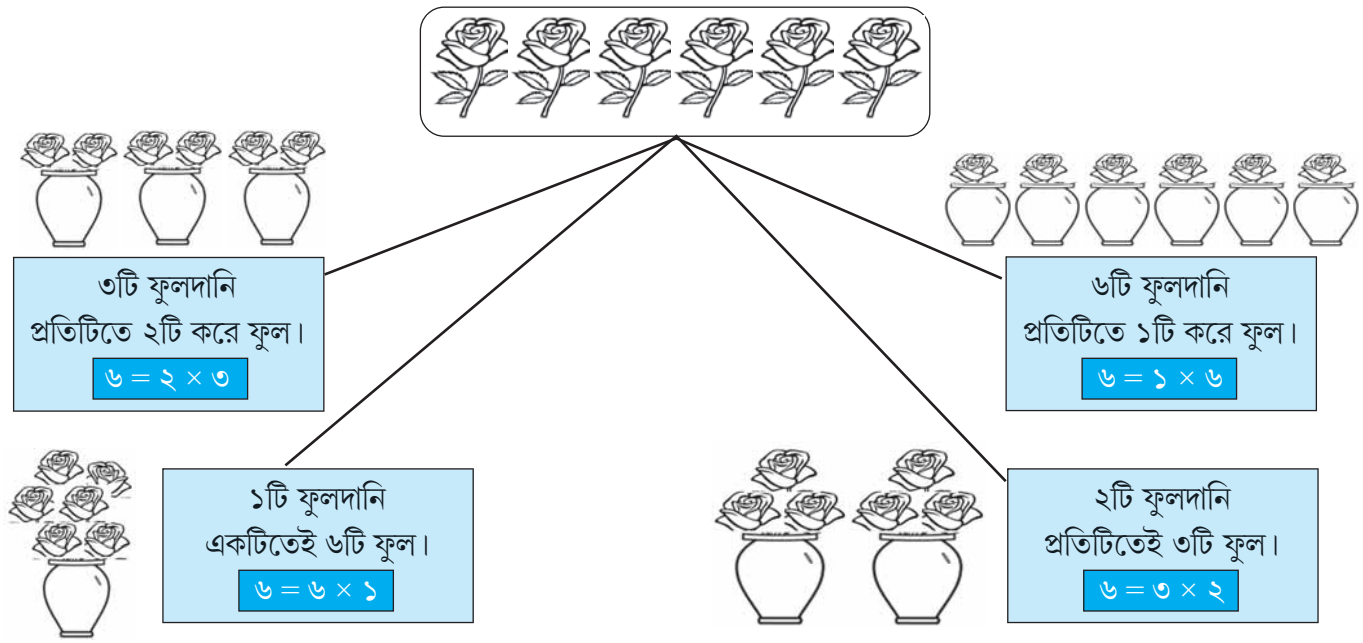

৬টি গোলাপ সমান সংখ্যায় ভাগ করতে হলে ফুলদানি লাগবে ১টি বা ২টি বা ৩টি বা ৬টি।

১, ২, ৩, ৬ হল ৬ এর গুণনীয়ক বা উৎপাদক ।

৪টি ডালিয়া কতগুলি ফুলদানিতে সমান সংখ্যায় রাখতে পারি খুঁজে দেখি।

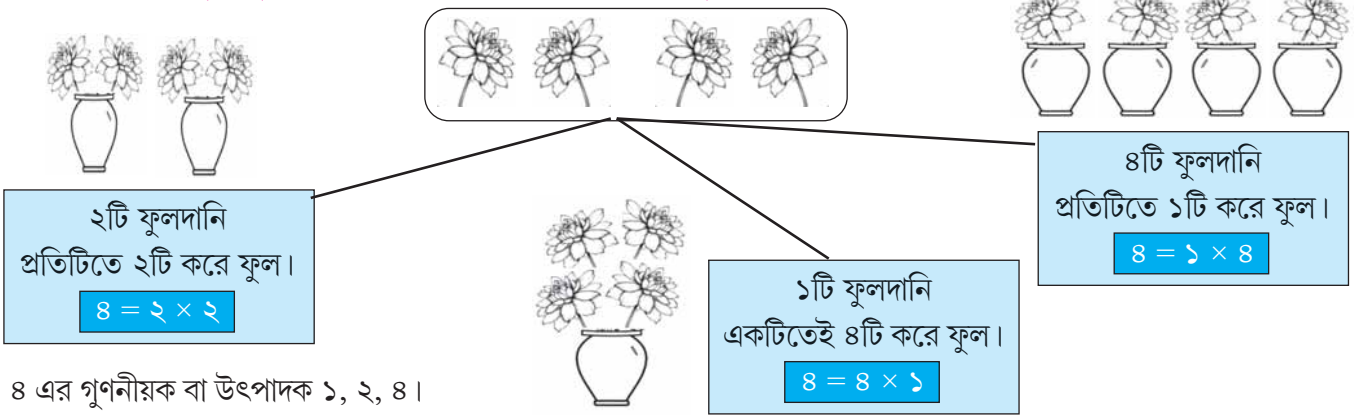

৪ এর গুণনীয়ক বা উৎপাদক ১, ২, ৪।

৪ এর গুণনীয়ক বা উৎপাদক ১ , ২ , ৪।

৬ এর গুণনীয়ক বা উৎপাদক ১ , ২ , ৩, ৬।

১, ২ কে ৪ ও ৬ এর **সাধারণ গুণনীয়ক** বলে।

৪টি ডালিয়া আর ৬টি গোলাপ একসঙ্গে ১টি বা ২টি ফুলদানিতে সমান ভাগে রাখা যাবে।

অথবা

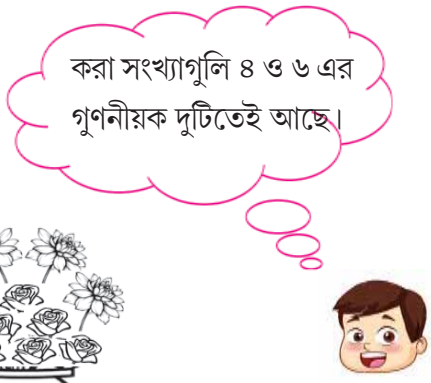

৪টি ডালিয়া আর ৬টি গোলাপ একসঙ্গে সবথেকে বেশি ২টি ফুলদানিতে সমান ভাগে রাখা যাবে।

৪ ও ৬ এর সবথেকে **বড়ো সাধারণ গুণনীয়ক বা গ.সা.গু.** ২।

নিজে করি :

১২টি নাড়ু কী কী ভাবে সমান সংখ্যায় ভাগ করতে পারি :

১২ = ১ × ১২ ১২ = ১২ × ১

১২ = ৩ × ৪ ১২ = ৪ × ৩

১২ = ৬ × ২ ১২ = ২ × ৬

১২ এর গুণনীয়কগুলি–

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

১৮টি লেবু কী কী ভাবে সমান সংখ্যায় ভাগ করতে পারি :

১৮ = ☐ × ☐ ১৮ = ☐ × ☐

১৮ = ☐ × ☐ ১৮ = ☐ × ☐

১৮ = ☐ × ☐ ১৮ = ☐ × ☐

১৮ এর গুণনীয়কগুলি–

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

১৬ এর গুণনীয়ক খুঁজি:

১৬ = ☐ × ☐ ১৬ = ☐ × ☐

১৬ = ☐ × ☐ ১৬ = ☐ × ☐

১৬ = ☐ × ☐

১৬ এর গুণনীয়কগুলি:

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

২৪ এর গুণনীয়ক খুঁজি :

২৪ = ☐ × ☐ ২৪ = ☐ × ☐

২৪ = ☐ × ☐ ২৪ = ☐ × ☐

২৪ = ☐ × ☐

২৪ এর গুণনীয়কগুলি :

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

১৬ ও ২৪ এর সাধারণ গুণনীয়কগুলি → ☐ ☐ ☐ ☐

১৬ ও ২৪ এর সবথেকে বড়ো বা গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক → ☐

বিভাজ্যতার শর্ত

শিক্ষার্থীরা এই পাঠ থেকে :

- ২, ৩, ৫, ৯ ও ১০ দ্বারা বিভাজ্যতার শর্ত প্রকাশ করতে পারবে।

মিল খুঁজে শর্ত লিখি

২ এর গুণিতক – ২, ৪, ৬, ৮, ১০, ১২, ১৪, ১৬, ১৮, ২০, ২২, ২৪, ২৬ .....। এই সংখ্যাগুলিকে ২ দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ শূন্য হবে। এই সংখ্যাগুলি ২ দিয়ে বিভাজ্য।

সংখ্যাগুলির এককের ঘরের অঙ্ক ◯ করি:

২, ৪, ৬, ৮, ১০, ১২, ১৪, ১৬, ১৮, ২০, ২২, ২৪, ২৬ .....

২ দিয়ে বিভাজ্যতার শর্ত– সংখ্যার এককের ঘরের অঙ্ক ☐ বা ☐ বা ☐ বা ☐ বা ☐ হবে।

৫ এর গুণিতক – ৫, ১০, ১৫, ২০, ২৫, ৩০, ৩৫, ৪০, ৪৫, ৫০, ৫৫, ৬০, ৬৫, ৭০.....।

সংখ্যাগুলির এককের ঘরের অঙ্কে ◯ করি:

৫, ১০, ১৫, ২০, ৩০, ৪০, ৪৫, ৫০, ৫৫, ৬০, ৬৫, ৭০.....

৫ দিয়ে বিভাজ্যতার শর্ত– সংখ্যার এককের ঘরের অঙ্ক ☐ বা ☐ হবে।

১০ এর গুণিতক – ১০, ২০, ৩০, ৪০, ৫০, ৬০, ৭০, ৮০, ৯০, ১০০, ১১০, ১২০.....।

সংখ্যাগুলির এককের ঘরের অঙ্কে ◯ করি:

১০, ২০, ৩০, ৪০, ৫০, ৬০, ৭০, ৮০, ৯০, ১০০, ১১০, ১২০.....।

১০ দিয়ে বিভাজ্যতার শর্ত – সংখ্যার এককের ঘরের অঙ্ক ☐ হবে।

৩ এর গুণিতক – ৩, ৬, ৯, ১২, ১৫, ১৮, ২১, ২৪, ২৭, ৩০, ৩৩, ৩৬, ৩৯, ৪২, ৪৫.....।

সংখ্যাগুলির অংকগুলিকে যোগ করে দেখি:

২৭	→	২	+	৭	=	৯	→	৩ দিয়ে বিভাজ্য
৪২	→	☐	+	☐	=	☐	→	☐
৩৯	→	☐	+	☐	=	☐	→	☐
৪৫	→	☐	+	☐	=	☐	→	☐

৩ দিয়ে বিভাজ্যতার শর্ত– সংখ্যার অঙ্কগুলির সমষ্টি ☐ দিয়ে বিভাজ্য হবে।

৯ এর গুণিতক – ৯, ১৮, ২৭, ৩৬, ৪৫, ৫৪, ৬৩, ৭২, ৮১, ৯০, ৯৯, ১০৮, ১১৭.....।

সংখ্যাগুলির অংকগুলিকে যোগ করে দেখি:

৬৩ → ৬ + ৩ = ৯ → ৯ দিয়ে বিভাজ্য

৮১ → ☐ + ☐ = ☐ → ☐

১০৮ → ☐ + ☐ + ☐ = ☐ → ☐

১১৭ → ☐ + ☐ + ☐ = ☐ → ☐

৯ দিয়ে বিভাজ্যতার শর্ত– সংখ্যার অঙ্কগুলির সমষ্টি ☐ দিয়ে বিভাজ্য হবে।

নিজে করি :

ভাগ না করে বুঝে লিখি কোন সংখ্যা কী দিয়ে বিভাজ্য:

১১৮, ৩৫১, ২৪২, ১৯৫, ৪৩২, ১৭২, ২৩০, ৬০০, ৫৫৫, ১১১, ২২৫, ৮২, ৭০, ১২৬				
২ দিয়ে বিভাজ্য	৩ দিয়ে বিভাজ্য	৫ দিয়ে বিভাজ্য	৯ দিয়ে বিভাজ্য	১০ দিয়ে বিভাজ্য

মৌলিক সংখ্যা ও যৌগিক সংখ্যা

শিক্ষার্থীরা এই পাঠ থেকে :

- সংখ্যাশ্রেণি থেকে মৌলিক সংখ্যা ও যৌগিক সংখ্যা আলাদা করতে পারবে।
- পরস্পর মৌলিক সংখ্যা যাচাই করতে পারবে।

নিজে করি :

	গুণনীয়ক বা উৎপাদক	উৎপাদকের সংখ্যা
১২	১ ২ ৩ ৪ ৬ ১২	৫ টি
৭		টি
১৫		টি
২		টি
৪		টি
২০		টি
১		টি

৭, ২ এদের উৎপাদক ১ এবং সেই সংখ্যা। এদের উৎপাদকের সংখ্যা ____ টি। এদের মৌলিক সংখ্যা বলে। মৌলিক সংখ্যার ১ এবং সেই সংখ্যা ছাড়া আর কোন উৎপাদক নেই।

১২, ১৫, ২০ এদের ২ টির ____ উৎপাদক। এদের যৌগিক সংখ্যা বলে।

যৌগিক সংখ্যার ১ এবং সেই সংখ্যা ছাড়া অন্য উৎপাদক আছে।

১-এর উৎপাদক ____ টি, তাই ১ মৌলিক সংখ্যাও নয় আবার যৌগিক সংখ্যাও নয়।

দুটি সংখ্যার সাধারণ গুণনীয়ক কেবলমাত্র ১ হলে তাদের পরস্পর মৌলিক সংখ্যা বলে।

পরস্পর মৌলিক সংখ্যা কিনা যাচাই করি :

৫-এর গুণনীয়ক ____ , ____ । ৯-এর গুণনীয়ক ____ , ____ , ____ । ৫ ও ৯ এর সাধারণ গুণনীয়ক ____ ।	৫ ও ৯ পরস্পর মৌলিক সংখ্যা
২১-এর গুণনীয়ক ____ , ____ , ____ , ____ । ২৫-এর গুণনীয়ক ____ , ____ , ____ । ২১ ও ২৫ এ সাধারণ গুণনীয়ক —	

ত্রিভুজ

শিক্ষার্থীরা এই পাঠ থেকে :

- ত্রিভুজাকার চিত্র আঁকতে শিখবে।
- বাহুভেদে বিভিন্ন ত্রিভুজাকার ক্ষেত্র বা ত্রিভুজাকার চিত্র আঁকতে শিখবে।
- লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক বা ল.সা.গু. নির্ণয় করতে পারবে।

চিত্র ও ক্ষেত্র চিনি

← চিত্রের ধার

চিত্রের ধার →

এটি চিত্র। এর আকার আছে কিন্তু কোন জায়গা দখল করে না বললেই চলে। এটির তিনটি ধার তাই এটি ত্রিভুজাকার চিত্র বা ত্রিভুজ

এটি ক্ষেত্র। এটি কিছুটা জায়গা দখল করে আছে। এটির তিনটি ধার তাই এটি ত্রিভুজাকার ক্ষেত্র।

বিন্দু জুড়ে ত্রিভুজ আঁকি

ক ●

প্রথমে ক ও খ বিন্দু সোজা দাগ টেনে জুড়ি।
এবারে খ ও গ বিন্দু জুড়ি।
শেষে গ ও ক বিন্দু জুড়ি।

খ ● গ ●

ত্রিভুজাকার চিত্রের বাহুগুলি হল ক খ , ☐ ও ☐ ।

স্কেল বা কাঠি দিয়ে মেপে দেখি ☐

সবথেকে বড়ো বাহু ☐ এবং সবথেকে ছোটো বাহু ☐।

বুঝি যে ত্রিভুজের তিনটি ধার ☐ (সমান/অসমান)।

যে ত্রিভুজের তিনটি ধার বা বাহুগুলির দৈর্ঘ্যই আলাদা সেটি বিষমবাহু ত্রিভুজ ।

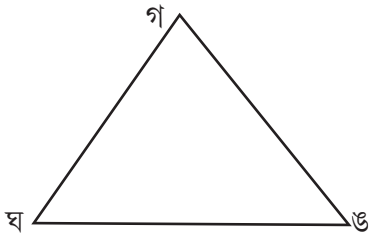

ত্রিভুজের বাহুগুলি হল ☐, ☐ ও ☐।

স্কেল বা কাঠি দিয়ে মেপে দেখে খোপে = বা ≠ বসাই-

গ ঘ ☐ ঘ ঙ , গ ঘ ☐ ঙ গ , ঘ ঙ ☐ ঙ গ

বুঝি যে ত্রিভুজের তিনটি ধার ☐ (সমান/অসমান)।

যে ত্রিভুজের তিনটি ধার বা বাহুগুলির দৈর্ঘ্যই আলাদা সেটি সমবাহু ত্রিভুজ ।

ক● ত্রিভুজের বাহুগুলি হল ☐, ☐ ও ☐।

স্কেল বা কাঠি দিয়ে মেপে দেখে খোপে = বা ≠ বসাই-

প ফ ☐ ফ ব , ফ ব ☐ ব প , প ফ ☐ ব প

খ● গ● বুঝি যে ত্রিভুজের তিনটি ধার ☐ (সমান/অসমান)।

যে ত্রিভুজের দুটি ধার বা বাহুর দৈর্ঘ্য সমান সেটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ ।

ধারের মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে ত্রিভুজগুলির নাম লিখি :

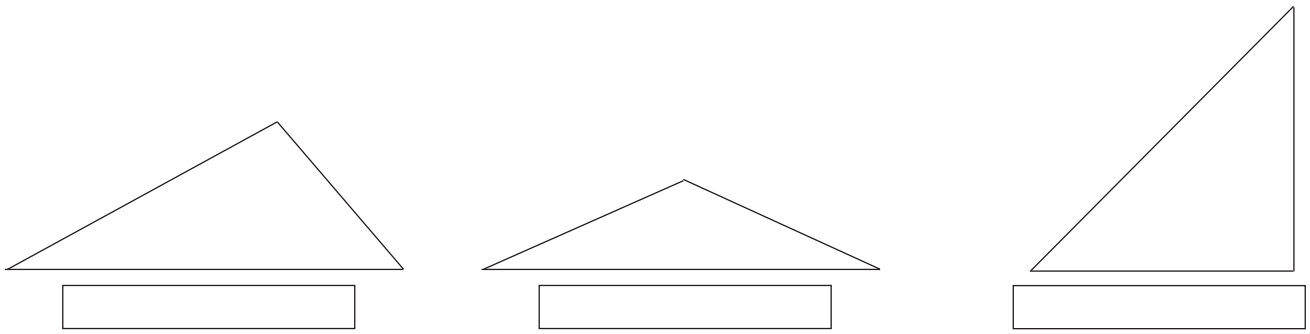

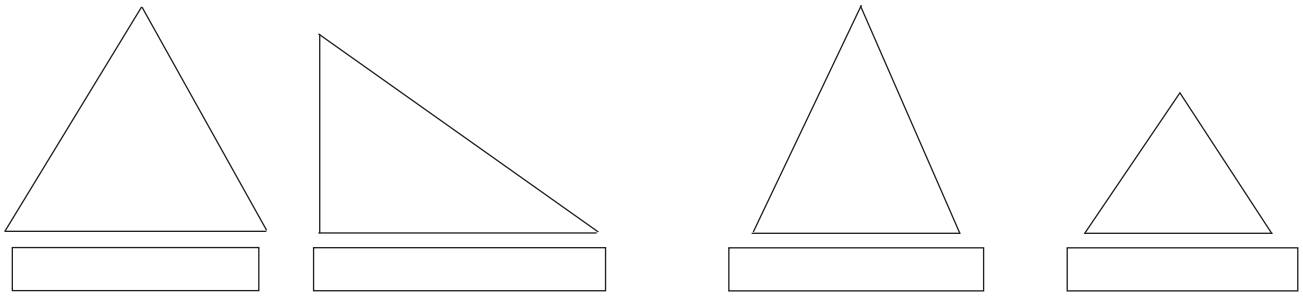

পরিসীমা

শিক্ষার্থীরা এই পাঠ থেকে :

- জ্যামিতিক আকারের পরিসীমা নির্ণয় করতে পারবে।

মাদুরের ধার মুড়ে দিই

এটি আয়তক্ষেত্রেকার চিত্র।
লম্বা ধারকে বলে [দৈর্ঘ্য] ।
অন্য ধারকে বলে [প্রস্থ] ।

মাদুরের [ ] ধার। উল্টো দিকের ধারগুলির দৈর্ঘ্য পরস্পর [ ] (সমান/অসমান)।

চারটি ধারের মোট দৈর্ঘ্য = ১২০ সেমি. + ৬০ সেমি. + ১২০ সেমি. + ৬০ সেমি. = ৩৬০ সেমি.। ৩৬০ সেমি. হল কার্পেটের [পরিসীমা]।

[যেকোন ক্ষেত্রের ধারগুলির মোট দৈর্ঘ্য হলো ক্ষেত্রটির পরিসীমা।]

ছবির চারধারের ফ্রেমের দৈর্ঘ্য হিসেব করি :

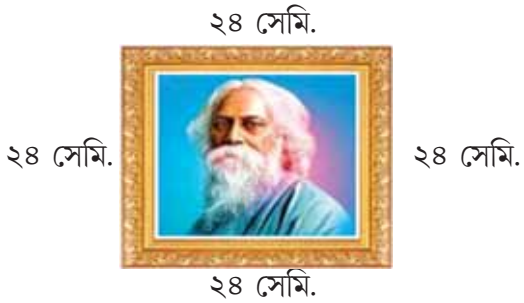

ফ্রেমের পরিসীমা =

[ ] সেমি. + [ ] সেমি. + [ ] সেমি. + [ ] সেমি.

= [ ] সেমি.

ফ্রেমের দৈর্ঘ্য [ ] সেমি.।

এটি বর্গক্ষেত্রের চিত্র। এর চারটি ধার সমান।

ক্ষেত্রগুলির পরিসীমা হিসেব করি :

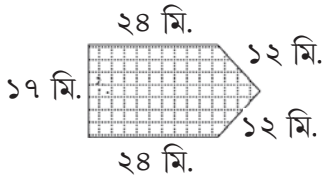

পরিসীমা = [ ] মি. + [ ] মি. + [ ] মি. + [ ] মি. + [ ] মি.

= [ ] মি.

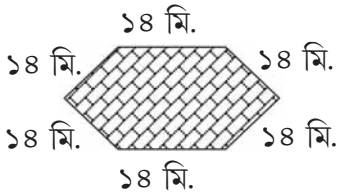

পরিসীমা = [ ] মি. + [ ] মি. + [ ] মি. + [ ] মি. + [ ] মি. + [ ] মি.

= [ ] মি.

ঐকিক নিয়ম

শিক্ষার্থীরা এই পাঠ থেকে :

- ঐকিক নিয়ম প্রয়োগ করে বাস্তব সমস্যা সমাধান করতে পারবে।

দাম হিসেব করি

জিনিস 	দাম ১৮ টাকা ☐ টাকা
জিনিস 	দাম ২৪ টাকা ☐ টাকা
জিনিস 	দাম ২৫ টাকা ☐ টাকা
জিনিস ১ টি ৫ টি	দাম ২০ টাকা ☐ টাকা

১টি ডিমের দাম ☐ (কম/বেশি) হবে।

১টি ডিমের দাম

= ১৮ ÷ ৪ টাকা = ☐ টাকা

কম সংখ্যক কলা কিনলে ☐ (কম/বেশি) দাম দিতে হবে।

জিনিসের পরিমাণ কমলে দামও ☐ (কমবে/বাড়বে)

১টি আপেলের দাম

= ☐ ☐ ☐ টাকা = ☐ টাকা

৩টি বইয়ের দাম ☐ (কম/বেশি) হবে।

৩টি বইয়ের দাম

= ২৫ × ৩ টাকা = ☐ টি

জিনিসের পরিমাণ বাড়লে দামও ☐ (কমবে/বাড়বে)

৫টি খাতার দাম

= ☐ ☐ ☐ টাকা = ☐ টাকা

ঘনবস্তু ও তল

শিক্ষার্থীরা এই পাঠ থেকে :

- আয়তঘন, ঘনক ও গোলকাকার বস্তুকে চিহ্নিত করতে পারবে।
- সমতল, বক্রতল আলাদা করে চিহ্নিত করতে পারবে।

চেনা জিনিসের নাম লিখি

এদের বাইরের আকারগুলি দেখতে প্রায় একইরকম। এই আকারের নাম **আয়তঘন**

এদের বাইরের আকারগুলি দেখতে প্রায় একইরকম। এই আকারের নাম **ঘনক**

এদের বাইরের আকারগুলি দেখতে প্রায় একইরকম। এই আকারের নাম **গোলক** ।

এই জিনিসগুলির উপরে হাত বুলালে আমরা **তল** অনুভব করি।

এর তলের উপর স্কেল রাখলে স্কেলটি তলের সাথে মিশে থাকে

এই তল সমতল

এর তলের উপর স্কেল রাখলে স্কেলটি তলের সাথে মিশে যায় না।

এই তল বক্রতল

সরলের নিয়ম

শিক্ষার্থীরা এই পাঠ থেকে :

- বাস্তব সমস্যাকে সহজ অঙ্কের ভাষায় প্রকাশ করতে পারবে।
- অঙ্কের ভাষায় প্রকাশিত সরল অঙ্ক সমাধান করতে পারবে।।

রং পেন্সিল ভাগ করি

সোনার কাছে ৩টি রঙের বাক্স আছে। বাবা সোনাকে আরও ২টি রঙের বাক্স দিলেন।

সোনার কাছে এখন রঙের বাক্স- (৩ + ২) = ৫টি

সোনা তার থেকে ১টি রঙের বাক্স বন্ধু মিনাকে দিয়ে দেয়। মিনাকে দেওয়ার পর এখন সোনার কাছে রঙের বাক্স- (৫ - ১) = ৪টি

গণিতের ভাষায়- (৩ + ২ - ১)

( ) - এই চিহ্নটি প্রথম বন্ধনী।

এখন প্রতিটি রঙের বাক্সে ১০টি করে রঙ পেন্সিল আছে। তাহলে ৪টি বাক্সে রঙ পেন্সিল আছে - ৪ × ১০ = ৪০

গণিতের ভাষায়- {(৩ + ২ - ১)×১০}

{ } - এই চিহ্নটি দ্বিতীয় বন্ধনী।

সোনা এই রঙ পেন্সিলগুলি ২ ভাইয়ের মধ্যে ভাগ করে দেয়।

তাহলে প্রত্যেক ভাই পায়- ৪০÷২ = ২০

গণিতের ভাষায়- {(৩ + ২ - ১)×১০}÷২

গণিতের ভাষায় লিখি :

{(৩ + ২ - ১)×১০}÷২
={(৫ - ১)×১০}÷২
={৪×১০}÷২
=৪০÷২
=২০

আলমারির প্রথম তাকে ২২টি এবং দ্বিতীয় তাকে ১৪টি বই আছে। বইগুলি একসঙ্গে করে ৩টি বাক্সে রাখা হলো। প্রতিটি বাক্সে কয়টি বই থাকবে?

(☐ + ☐) ÷ ☐

হারু ৬০ টাকা নিয়ে বাজারে গেলো তার থেকে ২৫ টাকার মাছ কিনলো। বাকি টাকা থেকে ১৩ টাকার আলু কিনলো। বাকি টাকা সমান ২ ভাগ করে এক অংশ টুবাই কে দিলো। টুবাই কত টাকা পেলো?

{(☐ − ☐) − ☐} ÷ ☐

সরল অঙ্কে যে কাজগুলি পরপর করতে হয় :

প্রথম বন্ধনী → দ্বিতীয় বন্ধনী → ভাগ → গুণ → যোগ → বিয়োগ

$\{(৮ + ৭) \times ৬\} \div ৩$

()-এর কাজ করি

$= \{১৫ \times ৬\} \div ৩$

{ }-এর কাজ করি

$= ৯০ \div ৩$

$= ৩০$

$\{(৯ - ৩) \times ১১\} - ২৫$

$= \{\square \times ১১\} - ২৫$

$= \square - ২৫$

$= \square$

$\{৬০ - (৭ \times ৫)\} + ৪$

$= \{৬০ - \square\} + ৪$

$= \square + ২৫$

$= \square$

সরলফল = $\square$

$\{(৮১ \div ৯) \div (১২ \div ৪)\} \times ৩$

$= \{\square \div \square\} \times ৩$

$= \square \times ৩$

$= \square$

সরলফল = $\square$

$৩৫ - \{১১ + ৬ \times (৮ \div ২)\}$

$= ৩৫ - \{১১ + ৬ \times \square\}$

$= ৩৫ - \{১১ + \square\}$

$= ৩৫ - \square$

$= \square$

সরলফল = $\square$

$১৭ - \{৯ + ২ \times (৮ - ৩)\}$

$=$

$=$

$=$

$=$

সরলফল =

শেখার সেতু

আমাদের পরিবেশ

सत्यमेव जयते

বিদ্যালয় শিক্ষাবিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বিকাশ ভবন,
কলকাতা - ৭০০০৯১

পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন
বিকাশ ভবন,
কলকাতা - ৭০০০৯১

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ভবন
কলকাতা - ৭০০০৯১

বিশেষজ্ঞ কমিটি
নিবেদিতা ভবন, পঞ্চমতল
বিধাননগর,
কলকাতা : ৭০০০৯১

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

অভীক মজুমদার
চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি

মানিক ভট্টাচার্য
সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

পরিকল্পনা • সম্পাদনা • তত্ত্বাবধান

ঋত্বিক মল্লিক পূর্ণেন্দু চ্যাটার্জী রাতুল গুহ

বিষয় নির্মাণ, সম্পাদনা ও বিন্যাস

ড. ধীমান বসু îo˜#œ ö‡y¡ মহঃ মাসুদ আখতার অনিন্দিতা দে

সূচিপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
1.	পরিবেশের উপাদান : জীবজগৎ	1
2.	পরিবেশের উপাদান : জড়বস্তুর জগৎ	7
3.	শরীর	12
	নমুনা প্রশ্নপত্র ১	17
4.	আবহাওয়া ও বাসস্থান	19
5.	আমাদের আকাশ	27
6.	প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের অভিজ্ঞতা	32
7.	জীবিকা ও সম্পদ	38
	নমুনা প্রশ্নপত্র ২	42

ব্রিজ মেটিরিয়াল ব্যবহার প্রসঙ্গে

- ব্রিজ মেটিরিয়ালটি শিক্ষার্থীদের কাছে একটি 'অ্যাকসিলারেটেড লার্নিং প্যাকেজ' হিসেবে কাজ করবে।
- অতিমারির কারণে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন অনুপস্থিতির জন্য শিখনের ক্ষেত্রে যে ঘাটতি তৈরি হয়ে থাকতে পারে, এই ব্রিজ মেটিরিয়ালটি সেই ঘাটতি পূরণে সহায়ক হবে।
- অন্তত ১০০ দিন ধরে সব শিক্ষার্থীর জন্যই ব্রিজ মেটিরিয়ালটি ব্যবহৃত হবে। প্রয়োজনে, বিশেষ কিছু শিক্ষার্থীর জন্য মেটিরিয়ালটির ব্যবহারের মেয়াদ আরও কিছু দিন বাড়ানো যেতে পারে।
- এই ব্রিজ মেটিরিয়ালটির মূল ফোকাস গত দুটি শিক্ষাবর্ষের দুটি শ্রেণির বিষয়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ শিখন সামর্থ্যের সঙ্গে বর্তমান শিক্ষাবর্ষের বা শ্রেণির সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি ব্রিজ মেটিরিয়ালে অন্তর্ভুক্ত করা।
- বেশ কিছু ক্ষেত্রে এই মেটিরিয়ালটির কিছু অংশ প্রবেশক (foundation study content) হিসেবে কাজ করবে।
- যেহেতু ব্রিজ মেটিরিয়ালটি কাম্য শিখন সামর্থ্যের ভিত্তিতে তৈরি, তাই শিক্ষিকা/শিক্ষকদের এই মেটিরিয়ালটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি সার্বিক ভাবনা যেন ক্রিয়াশীল থাকে।
- প্রয়োজন বুঝে শিক্ষিকা/শিক্ষক এই ব্রিজ মেটিরিয়ালের সঙ্গে পাঠ্য বইকে জুড়ে নিতে পারেন।
- এই ব্রিজ মেটিরিয়ালটি নির্দিষ্ট সিলেবাস প্রস্তাবিত বিষয়ের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হবে।
- এই ব্রিজ মেটিরিয়ালের ওপরেই শিক্ষার্থীদের নিয়মিত মূল্যায়ন চলবে।

1 পরিবেশের উপাদান : জীবজগৎ

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- জীব আর জড় পদার্থ চিহ্নিত করতে পারবে।
- জীব আর জড় পদার্থের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে।
- চারপাশের জীবদের উদ্ভিদ আর প্রাণী এই দুভাগে ভাগ করতে পারবে।
- জীবজগতে জীবদের পারস্পরিক নির্ভরতা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- উদ্ভিদ আর প্রাণীদের বৈচিত্র্য আলোচনা করতে পারবে।
- জীবদের হারিয়ে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- জীবদের সংরক্ষণের উপায় আলোচনা করতে পারবে।

জীব আর জড়

তুমি দেখলে তোমার পড়ার টেবিলে তোমার পেনের পাশে একটা টিকটিকি বসে আছে। তোমাকে দেখেই টিকটিকিটা পালিয়ে গেল। পেন হলো জড় পদার্থ আর টিকটিকিটা হলো জীব।

আবার তুমি দেখলে আকাশে ঘুড়ি উড়ছে। আর তারই পাশ দিয়ে একটা পাখি উড়ে যাচ্ছে। ওই পাখিটা হলো জীব। আর ঘুড়িটা হলো জড় পদার্থ। কেন বলোতো? কারণ পাখিটা তো নিজে নিজেই উড়ছে। উড়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাচ্ছে। কিন্তু ঘুড়িটাকে কেউ সুতোয় বেঁধে ওড়াচ্ছে। ঘুড়িটা নামিয়ে এনে মেঝেয় ফেলে রাখো। দেখবে ঘুড়িটা আর উড়ছে না।

জড় পদার্থ আর জীবের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য আছে। জড় পদার্থ (যেমন - পেন, ঘুড়ি) শ্বাস নিতে ও শ্বাস ছাড়তে পারে না। জড় পদার্থ নিজে থেকে জায়গা পরিবর্তন করতে পারে না। আবার নিজে থেকে আকারেও বাড়ে না। জীবরা কিন্তু এইসবই করতে পারে।

এছাড়াও জীবেরা নতুন জীবের জন্ম দিতে পারে। যেমন — পাখি আর টিকটিকি তাদের বাচ্চার জন্ম দেয়। জীবরা আবার মারাও যায়।

তোমার আশেপাশে দেখা কয়েকটা প্রাণীর নাম লেখো। তাদের কী কী করতে দেখেছো লেখো।

প্রাণীর নাম	কী কী করতে দেখেছো
পাখি	উড়ে যাওয়া, বাচ্চা পাখির জন্ম দেওয়া
কুকুর	
টিকটিকি	

নানা ধরনের জীব নিয়েই জীবজগৎ

বাঘ

কলমীশাক

সাপ

মেছোবিড়াল

নারকেল গাছ

পাইন গাছ

বাবুই পাখি ও তার বাসা

মাছ

রেডপান্ডা

ক্যাকটাস

পলাশফুল

গন্ডার

সিংহ

কেঁচো

মাছরাঙা

বাদাবন

আম, জাম, কাঁঠাল, গোলাপ, গাঁদা, জবা, কুমড়ো, বট, ঝাউ, পাইন, অশ্বত্থ, নিম — তোমরা তোমাদের চারপাশে ছোটো-বড়ো কত গাছই না দেখতে পাও। ছোটো গাছ, বড়ো গাছ — এদের একসঙ্গে উদ্ভিদ বলে। সেইসব গাছে আবার কাক, পায়রা, চড়াই, শালিক কত পাখি এসে বসে। কেউ কেউ আবার ওই গাছেই থাকে। গাছে কাঠবেড়ালি, সাপও থাকে। পুকুরে রুই, কাতলা, পুঁটি — কতরকম মাছ থাকে। আবার বনে বাঘ, সিংহ, হরিণ কত প্রাণীই না থাকে। এরা ছাড়াও আরও কিছু জীব আছে। তারা এতই ছোটো যে তাদের আবার খালি চোখে দেখা যায় না। এইসব নিয়েই হলো **জীবজগৎ**।

তোমার চারপাশে দেখা জীবদের উদ্ভিদ আর প্রাণী এই দুভাগে ভাগ করে নীচের সারণিতে লেখো।

উদ্ভিদ	প্রাণী
বট	কাক
কুমড়ো	রুই

জীবজগতে নির্ভরতা

আমাদের চারপাশে কত বিভিন্ন রকমের প্রাণী। প্রত্যেকেই কিছু না কিছু খেয়ে বেঁচে রয়েছে। যেমন ঘাসফড়িং ঘাস খায়। আবার ব্যাং খায় ঘাসফড়িং। আর সাপ ব্যাং খায়। জমিতে পোকা মারার বিষ দিলে ঘাসফড়িং বা অন্য পোকারা মরে যেতে পারে। ফলে ব্যাঙের খাবারের অভাব দেখা দেবে। খাবারের অভাবে ব্যাঙের সংখ্যা কমে গেলে বিপদে পড়বে সাপেরা। এভাবেই প্রাণীরা একে অন্যকে খেয়ে বেঁচে থাকে।

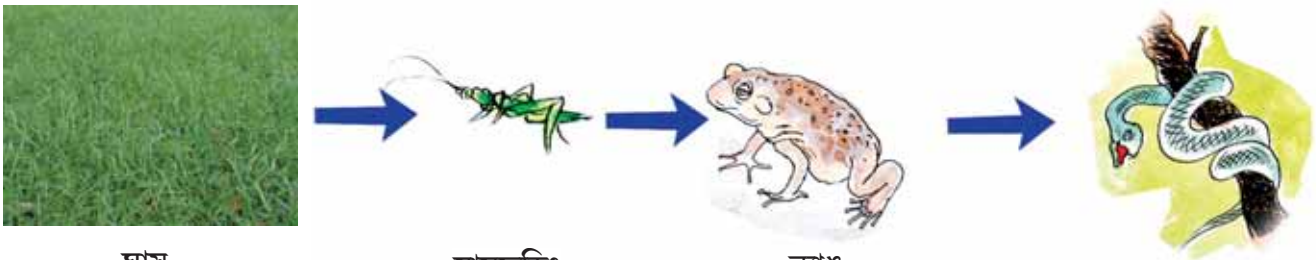

অর্থাৎ জীবজগতে একটা জীব অন্য জীবের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে। আমরাও অন্য জীবদের ওপর নির্ভর করি। আমরা সবাই সবার ওপর নির্ভর করে বেঁচে আছি।

তোমার পরিচিত প্রাণীরা একে অন্যকে খেয়ে বেঁচে থাকে। সেই অনুযায়ী নীচের ফাঁকা বাক্সগুলো ভরাট করো। তির চিহ্ন হচ্ছে কে কাকে খায় তার নির্দেশ।

গাছের পাতা → হরিণ → ☐

ধান → ☐ → পেঁচা

ঘাস/গাছের পাতা → খরগোশ → ☐

জলের শ্যাওলা → মাছ → ☐

উদ্ভিদ আর প্রাণীদের বৈচিত্র্য

আমাদের চারপাশে কত বিচিত্র রকমের উদ্ভিদ আর প্রাণীদের দেখা যায়। উদ্ভিদদের মধ্যে কেউ ডাঙার উদ্ভিদ। যেমন - বট, অশ্বত্থ, নারকেল, পাইন, শিমুল। এদের মধ্যে বট, অশ্বত্থ, নারকেল, শিমুল দেখা যায় সমতলে। আবার পাইন সাধারণত পাহাড়ি অঞ্চলে দেখা যায়। শুকনো মাটিতে জন্মায় ফণীমনসা। ফণীমনসার গায়ে কত কাঁটা। শিমুল গাছ থেকে তুলো পাওয়া যায়। শালুক, পদ্ম আবার হলো জলের উদ্ভিদ।

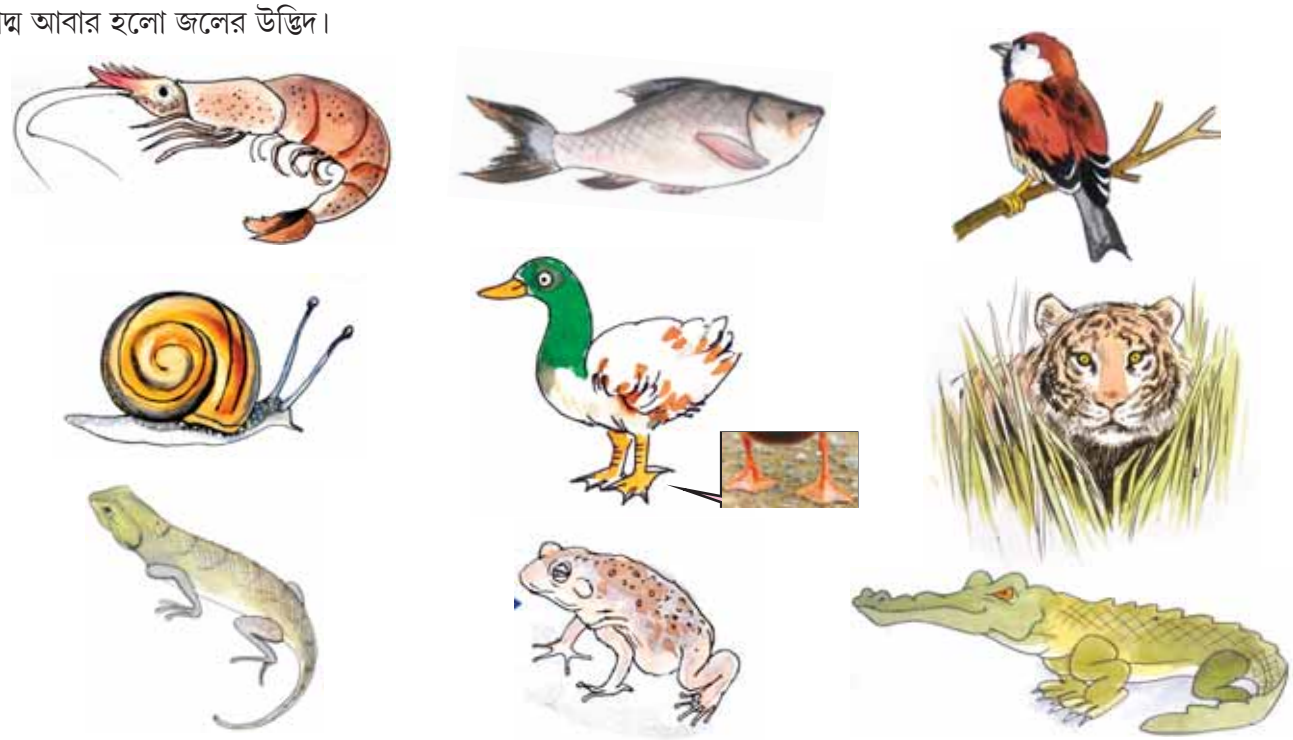

চিংড়ি আর মাছের মতো প্রাণীরা জলে সাঁতার কাটে। মাছের সারা শরীর জুড়ে আঁশ আছে। আর আছে পাখনা। শামুকের নরম শরীর শক্ত খোলসে ঢাকা থাকে। সাঁতার কাটার জন্য হাঁসের পায়ের আঙুলগুলো আবার জোড়া। হাঁস কিন্তু পাখি। বেশির

ভাগ পাখিরা আকাশে উড়ে বেড়ায়। পাখিদের শরীরের ভেতর বাতাস ভরা থলি আছে। যা তাদের আকাশে উড়তে সাহায্য করে। বাঘের মতো কেউ চারপায়ে হাঁটে। কেউ আবার দু-পায়ে হাঁটে। কেউ আবার বুকে হেঁটে চলে। গিরগিটি গায়ের রং বদলাতে পারে। আত্মরক্ষার জন্য শজারুর গায়ে কাঁটা আর ভালুকের থাবায় নখ থাকে।

টিকটিকি

কেন্নো আর টিকটিকির মতো প্রাণীরা বুকে হেঁটে চলে। কিন্তু এরা একই ধরনের প্রাণী নয়। কেন্নোকে ছুঁলেই গোল হয়ে যায়। কিন্তু টিকটিকিকে ছুঁলে তো গোল হয় না! কেন এমন হয়? কারণ কেন্নোর কোনো শিরদাঁড়া নেই। কিন্তু টিকটিকির শিরদাঁড়া আছে। তাই সে কেন্নোর মতো গোল হতে পারে না। আবার সাপের শিরদাঁড়া থাকলেও গুটিয়ে থাকতে পারে।

কেন্নো

আরশোলা, পোকামাকড়, কেঁচো, চিংড়ি, কৃমি — সবই কেন্নোর মতো প্রাণী। মাছ, ব্যাং, কচ্ছপ, ময়ূর, বাঘ আর আমরা মানুষরা — আমাদের সবার শিরদাঁড়া আছে।

হারিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন জীব

বাঘ, গন্ডার, বিভিন্ন ধরনের পাখি, মাছ, ব্যাঙ, বিভিন্ন উদ্ভিদ হারিয়ে যেতে বসেছে। এইসব প্রাণীদের হারিয়ে যাওয়ার পেছনে বেশ কিছু কারণ আছে। চেয়ার, টেবিল, খাট ইত্যাদি বানানোর জন্য কাঠ লাগে। কাঠের জন্য জঙ্গলের গাছ কেটে ফেলা হয়। ঘরবাড়ি বানানোর জন্যও জঙ্গল সাফ করা হয়। মানুষ জঙ্গল কেটে ফেলায় এইসব প্রাণীদের থাকার জায়গা হারিয়ে যাচ্ছে। চোরাশিকারিরা বাঘের চামড়া, নখ, হাড় — এসবের লোভে বাঘ মেরে ফেলছে। আবার কখনও বা খড়্গের লোভে একশৃঙ্গ গন্ডার মেরে ফেলছে। মানুষ মাংসের জন্য হরিণ, বুনো শুয়োর শিকার করে। এর ফলে পৃথিবীতে এইসব প্রাণীদের সংখ্যা ক্রমশ কমে যাচ্ছে। এরপর হয়তো এমন একটা সময় আসবে যখন বাঘ বা গন্ডার আর পৃথিবীতে থাকবে না। তখন বলা হবে যে বাঘ আর গন্ডার বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এছাড়াও মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনে লাগে এমন গাছও মানুষ নির্বিচারে কেটে ফেলছে। তার ফলে ওইসব গাছও হারিয়ে যেতে বসেছে।

হারিয়ে যাচ্ছে যেসব প্রাণী

রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার

একশৃঙ্গ গন্ডার

গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড

অলিভ রিডলে কচ্ছপ

সংরক্ষণ

বাঘ, একশৃঙ্গ গন্ডার,গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড, অলিভ রিডলে কচ্ছপ — এইসব জীবদের রক্ষা করার ব্যবস্থা করতে হবে। নাহলে এইসব জীবদের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অস্তিত্বও বিপন্ন হয়ে পড়বে। বিভিন্ন জীবের সংখ্যা যে যে কারণে কমে যাচ্ছে, সেই কারণগুলো যাতে না ঘটে তার ব্যবস্থা করা — এটাই হলো **সংরক্ষণ**। এই ব্যবস্থাগুলো কেমন হতে পারে? বনজঙ্গল না কাটা, বনজঙ্গলে প্রাণীদের খাবার ও তেষ্টার জল যাতে যথেষ্ট পরিমাণে থাকে তার ব্যবস্থা করা, চোরাশিকারিরা যেন বনের প্রাণীদের মারতে না পারে সেদিকে লক্ষ রাখা।

কী কী ভাবে জীবদের সংরক্ষণ করা যায় নীচে লেখো।

জীব সংরক্ষণের উপায়

মনে রাখা জরুরি :

- জড় পদার্থ শ্বাস নিতে ও শ্বাস ছাড়তে পারে না। কিন্তু জীব তা করতে পারে। জীব নতুন জীবের জন্ম দিতে পারে কিন্তু জড় পদার্থ তা পারে না।
- জীবজগতে সবাই সবার ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে।
- আরশোলা, কেঁচো, চিংড়ি, কৃমির মতো প্রাণীদের শিরদাঁড়া নেই। আবার মাছ, ব্যাঙ, কচ্ছপ, ময়ূর, বাঘের মতো প্রাণীদের শিরদাঁড়া আছে।
- বনজঙ্গল কেটে ফেলা, চোরাশিকার — এরকম বিভিন্ন কারণে পৃথিবী থেকে জীবরা হারিয়ে যাচ্ছে।
- যে যে কারণে জীবরা হারিয়ে যাচ্ছে, সেই কারণগুলো যাতে না ঘটে সেই ব্যবস্থা করাই হলো সংরক্ষণ।

তোমরা এই বিষয়ে চতুর্থ শ্রেণির 'পরিবেশের উপাদান : জীবজগৎ' অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে জানবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. **ঠিক উত্তর নির্বাচন করো :**

জড় পদার্থ হলো— (ক) ব্যাঙ (খ) কাগজ (গ) পাখি (ঘ) গাছ।

২. **শূন্যস্থান পূরণ করো :**

চিংড়ি একটি জলজ _____।

৩. **ঠিক বাক্যের পাশে '✓' আর ভুল বাক্যের পাশে '×' চিহ্ন দাও :**

৩.১ কেঁচোর শিরদাঁড়া আছে।

৩.২ শুকনো মাটিতে ফণীমনসা জন্মায়।

৪. **একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

বুকে হেঁটে চলে এমন একটি প্রাণীর নাম লেখো।

৫. **একটি বা দুটি বাক্যে উত্তর দাও :**

৫.১ জলে জন্মায় এমন দুটি গাছের নাম লেখো।

৫.২ পৃথিবী থেকে হারিয়ে যেতে চলেছে এমন দুটি প্রাণীর নাম লেখো।

৬. **দুটি বা তিনটি বাক্যে উত্তর দাও :**

৬.১ জীব ও জড় পদার্থের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৬.২ সংরক্ষণের কয়েকটি উপায় উল্লেখ করো।

2 পরিবেশের উপাদান : জড়বস্তুর জগৎ

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের পার্থক্য উল্লেখ করতে পারবে।
- জলের অবস্থার পরিবর্তন বলতে কী বোঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- জলের অবস্থার পরিবর্তনের ধারণা দিয়ে পরিবেশে ঘটে এমন নানা ঘটনার ব্যাখ্যা করতে পারবে।

সব কিছুর জন্য জায়গা লাগে

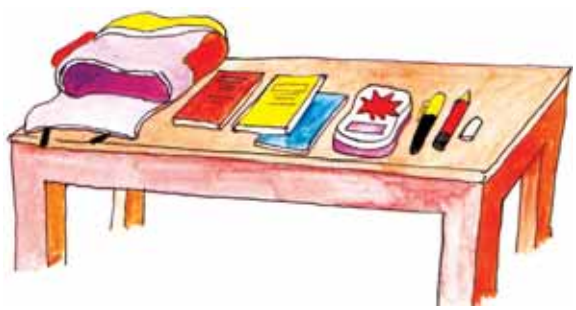

স্কুলের বইখাতা, পেন, পেনসিল বাক্স সব কিছু রাখতেই জায়গা লেগেছে

তোমরা স্কুলে যাও বইখাতা-পেন-পেনসিল বাক্স নিয়ে। তোমাদের বইখাতার চেয়ে একটা চাল বা ডালের দানা কত ছোট্ট জিনিস। একটা সরষে দানা আরো ছোটো, একটা বালির দানা আরোই। কিন্তু এদের সকলের মধ্যে দুটো মিল আছে। প্রথম কথা হলো এরা সকলেই কঠিন। আর দ্বিতীয় কথা হলো এরা যে যতই ছোটো হোক না কেন এদের রাখতে কিছুটা জায়গা লাগে। এরা সবাই এক একটা বস্তু। বস্তু যা দিয়ে তৈরি তাকে আমরা পদার্থ বলি। যেমন ধরো লোহার পেরেক বা লোহার চাবি আলাদা আলাদা কঠিন বস্তু। কিন্তু পদার্থটা একই, তা হলো লোহা। প্লাস্টিকের বোতল বা মগ হলো বস্তু কিন্তু প্লাস্টিক হলো পদার্থ।

তোমার চেনা কয়েকটি বস্তুর নাম ও সেগুলো কোন পদার্থ দিয়ে তৈরি তা নীচের সারণিতে বলা হলো। দেখো তো তুমি এইখানে আরও কিছু বস্তুর নাম যোগ করতে পারো কি না।

বস্তু	কী পদার্থ দিয়ে তৈরি
লোহার চাকা, পেরেক, রড, চাবি, কোদাল, যন্ত্রপাতি	লোহা
সোনার আংটি, কানের দুল, হাতের চুড়ি, গলার হার	সোনা
জলের বোতল, পেনসিল বাক্স, পেনের রিফিল, খেলনা পুতুল	প্লাস্টিক
	চিনে মাটি
	কাচ

তোমরা পড়লে যে নানান বস্তু তা ছোটোই হোক বা বড়োই হোক, রাখতে কিছুটা জায়গা লাগে। তোমাদের যে সব বস্তুর কথা বলা হলো — বইখাতা, পেন, বালির দানা, সর্ষে দানা—সবই কঠিন পদার্থ দিয়ে তৈরি। তাহলে আমরা বলতে পারি যে সব কঠিন পদার্থই কিছুটা জায়গা নেয়। এবার ধরো একটা জলভরতি বোতলের কথা। তাতে কি যত ইচ্ছে তত জল রাখা যাবে? তোমরা বলবে — তা কখনো হয়? ওতে যে জায়গাই নেই। ঠিক বলেছ। বোতলটায় আর যত খুশি জল ধরবে কী করে? জল তরল

পদার্থ কিন্তু তারও থাকতে গেলে জায়গা চাই। তাহলে বোঝা গেল যে কঠিন আর তরল পদার্থ রাখার জন্যও জায়গা লাগে। আচ্ছা, গ্যাস কি কোনো জায়গা দখল করে থাকতে পারে? —হ্যাঁ পারে। একটা বেলুনকে ফুলিয়ে বড়ো করার পর তার মুখ বেঁধে রাখো। এবার তাকে একটা জল ভরতি গামলায় ডোবাও। দেখবে বেলুনটা খানিকটা জলকে সরিয়ে দেয় যা গামলার বাইরে উপছে পড়ে। তাহলে বোঝা গেল গ্যাসভরতি বেলুনও জায়গা নেয়। তাহলে আমরা বুঝলাম যে কঠিন, তরল বা গ্যাস সবই কিছুটা জায়গা জুড়ে থাকে। 'জায়গা জুড়ে থাকে' কথাটার বদলে আমরা বলতে পারি কঠিন, তরল আর গ্যাস সব কিছুরই আয়তন আছে।

জলভরতি গ্লাসে আঙুল ডোবানো হচ্ছে

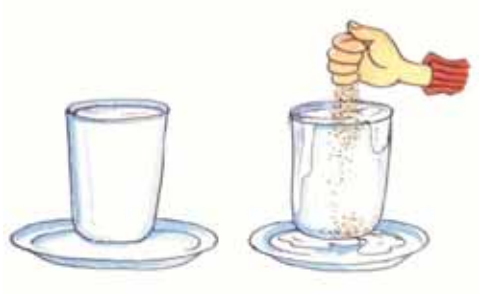

জলভরতি গ্লাসে বালি ফেলা হচ্ছে

একটা কানায় কানায় জলভরতি গ্লাসে তোমার আঙুল ডোবালে কী হবে বলো তো? দেখবে আঙুল ডোবানোর পরে খানিকটা জল উপছে পড়ল। কেন এমন হলো? — আঙুলের খানিকটা জায়গা লাগবে, সে গ্লাসের জলকে সরিয়ে দিয়ে নিজের থাকার জায়গা করে দিয়েছে।

ঐ একই রকমের গ্লাসটায় এবার কানায় কানায় জল রাখা হলো। এতে একটু করে বালি ফেলতে থাকলে দেখা যাবে যে বালি জলের নীচে গিয়ে জমছে। এরকম করতে করতে একটা সময় দেখা যাবে খানিকটা জল উপছে পড়ল। এখান কেন জল উপছে পড়ল? — কারণ প্রত্যেকটা বালির দানা যত ছোটোই হোক, একটু করে জায়গা নেয়। অনেক বালির দানা একসঙ্গে থাকলে তারা খানিকটা জলকে সরিয়ে দিয়েছে। একটা বালির দানার আয়তন খালি চোখে ততটা বোঝা যায়নি। কিন্তু অনেকগুলো বালির দানার মোট আয়তনটা বেশ বোঝা গেল।

এবার তুমি নিশ্চয়ই নীচের কবিতার মানে বুঝতে পারবে ?

'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণা,
বিন্দু বিন্দু জল —
গড়ি তোলে মহাদেশ,
সাগর অতল।'

কেউ বা কঠিন, কেউ বা তরল, কেউ বা গ্যাস

তোমাদের চেনা একটা জিনিস আছে যাকে খালি চোখে দেখা যায় না। সে হলো হাওয়া। হাওয়ায় অনেকরকম গ্যাস মিশে থাকে। উনুনের ধোঁয়াতেও নানান গ্যাস থাকে তবে, তার সঙ্গে কিছু গুঁড়োও মিশে থাকে। গ্যাসকে বন্ধ পাত্রে না রাখলে গ্যাস সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। গ্যাসের নিজস্ব কোনো আকার নেই, যে রকম দেখতে পাত্রেই রাখো না কেন, গ্যাস পাত্রের সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়বেই।

তরল পদার্থের নিজস্ব আকার নেই, যেমন পাত্রে রাখবে তারই মত আকার নেবে। এই ধরো না একটা মগের জলকে যদি একটা বোতলে ঢালি তাকে দেখাবে বোতলটার মতো। আবার একটা কড়ায় ঢাললে তাকে কড়ার মতই দেখাবে। তরল গড়িয়ে যেতে পারে, কিন্তু তরলের এই ছড়িয়ে পড়ার ক্ষমতাটা গ্যাসের মত তত বেশি নয়। তাই কোনো পাত্রে পুরোটা ভরতি না করে

খানিকটা তরল রাখলে তরল তার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে পারে না। একটা বোতলে খানিকটা জল রেখে দেখোতো জলটা পুরো বোতলটাতেই ছড়িয়ে পড়লো কি না।

কঠিন পদার্থের কিন্তু নিজস্ব আকার আছে, নিজে নিজে কঠিন ছড়িয়ে পড়তে পারে না। একটা চৌকোনা লোহার টুকরোকে তুমি যেমন খুশি আকৃতির পাত্রে রাখলেও তাকে সেই চৌকোনাই দেখতে থাকবে। তার আকৃতি কিন্তু পাল্টে যাবে না।

তাহলে কঠিন, তরল আর গ্যাসীয় পদার্থের সম্বন্ধে আমরা বলতে পারি তা হলো এইরকম :

কঠিন	তরল	গ্যাস
নিজস্ব আকৃতি আছে।	নিজস্ব আকৃতি নেই। যে পাত্রে রাখবে সেই পাত্রের মতোই দেখাবে।	নিজস্ব আকৃতি নেই। যে পাত্রে রাখবে তার সব জায়গায় ছড়িয়ে যাবে।
নিজস্ব আয়তন আছে।	নিজস্ব আয়তন আছে।	নিজস্ব আয়তন নেই। যে পাত্রে রাখবে তার সব জায়গায় ছড়িয়ে যাবে।
নিজে থেকে ছড়িয়ে পড়ে না।	ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতা আছে তবে তা গ্যাসের মতো বেশি নয়।	ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি।

ভারী আর হালকা

ধরো তুমি কোনো দোকানে গেছ চাল, ডাল, আলু কিংবা আটা কিনতে। সেখানে এক কেজি চাল কিনতে চাইলে যে বাটখারাটা দাঁড়িপাল্লায় চাপায়, দু কেজি চাল কিনতে গেলে তার চেয়ে বেশি ভারী বাটখারা চাপাতে হয়। আমরা বলব এক কেজি চালের চেয়ে দু কেজি চাল বেশি ভারী। চলতি কথায় আমরা বলি দু কেজি ওজনটা এক কেজির চেয়ে বেশি। কিন্তু ঠিকঠাক বললে বলতে হয় যে দু কেজি ভরটা এক কেজি ভরের চেয়ে বেশি। কোনো বস্তুর ভর হলো সেই বস্তুতে কতটা পদার্থ আছে তারই মাপ। অর্থাৎ বাটখারা দিয়ে কোনো জিনিসের ভর মাপা হয়। বস্তু যত বেশি ভারী, তার ভরও তত বেশি।

দাঁড়িপাল্লা

কঠিন আর তরলের যে ভর আছে তা আমরা হাতে নিয়েই বেশ বুঝতে পারি। কিন্তু গ্যাসেরও কি ভর আছে? হ্যাঁ, গ্যাসেরও ভর আছে। এই দেখো না, রান্নার গ্যাস ভরতি সিলিন্ডার যখন বাড়িতে আসে তখন সেটা কত ভারী থাকে। যত দিন যায়, ততই রান্নার কাজে গ্যাস পুড়তে পুড়তে একসময় প্রায় কিছুই থাকেনা ওতে। তখন সিলিন্ডারটা আগের চেয়ে অনেক হালকা হয়ে যায়। এর মানে হলো গ্যাসেরও ভর আছে।

একটা ছোটো বালির দানা খুবই ছোটো। হাতে নিলে আমরা বুঝতেই পারব না। কিন্তু এক বস্তা বালি কত ভারী, সহজে তোলাই যায় না। তাহলে বোঝা গেল যে বালির দানারও ভর ছিল, নইলে বস্তা ভরতি বালি অত ভারী লাগল কী করে?

যে কোনো পদার্থ, তা সে কঠিনই হোক, তরলই হোক বা গ্যাসই হোক, তার একটা ভর আছে, তা রাখতে কিছুটা জায়গাও লাগে। এর মানে হলো পদার্থের ভর ও আয়তন আছে।

বরফ গলে জল হলো, জল থেকে বাষ্প হলো

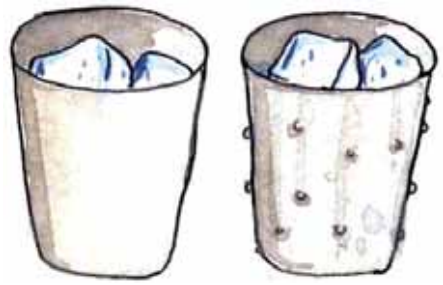

কাচের গ্লাসে বরফ রাখায় বাইরে জল জমেছে

একটা কাচের গ্লাসে বরফে রেখে গ্লাসটা খোলা হাওয়ায় রেখে দিলে একটু পরেই গ্লাসের বাইরের দিকের গায়ে জলের ফোঁটা জমে। কোথা থেকে জল এলো?

হাওয়ায় অনেক গ্যাস মিশে থাকে, আর থাকে জলীয় বাষ্প। যখন হাওয়া কোনো খুব ঠান্ডা কোনো বস্তুকে ছোঁয় তখন ওই জলীয় বাষ্পও ঠান্ডা হয়ে যায়। একসময় সেই ঠান্ডা বাষ্প থেকেই জলের ফোঁটা সৃষ্টি হয়।

বরফের ওপরে সাদা ধোঁয়ার মতো জিনিসটা কী জানো? হাওয়ায় জলীয় বাষ্পই ঠান্ডা বরফের সংস্পর্শে এসে খুব ছোটো ছোটো জল বিন্দু তৈরি করে। হাওয়ায় ভাসমান সেইসব জল কণার গায়ে যখন আলো পড়ে তখন সেই আলো নানান দিকে ঠিকরে যায়। ওই ছোটো ছোটো জলকণাগুলো যেহেতু দল বেঁধে থাকছে, তাই ওটা সাদা ধোঁয়ার মত দেখায়।

তুমি বলতে পারো— গ্লাস থেকে উঁচুতে সাদা ধোঁয়ার মতো দেখাচ্ছে না কেন?— আসলে খুব ছোটো ছোটো জলের ফোঁটা তাড়াতাড়ি উবে গিয়ে জলীয় বাষ্প হাওয়ায় মিশে যায়। তখন আর বাষ্পকে চোখে দেখা যায় না।

জল ফোটালে কী হয় দেখেছ নিশ্চয়ই? জল ফুটলে সেখানে গরম জলীয় বাষ্প তৈরি হয়। এই 'বাষ্প' থেকেই 'ভাপ' কথাটা এসেছে। এই যে বরফ গলে জল হওয়া, জল ফোটালে বাষ্প হওয়া এইসব ঘটনাকে বলে জলের অবস্থার পরিবর্তন।
যদি ফুটন্ত জলের একটু ওপরে একটা ঠান্ডা স্টিলের থালা ধরা হয়, তাহলে একটু পরে থালাটা কেমন ভিজে ওঠে। তুমি কি এমন ঘটতে দেখেছ? এখানে কী হয়? এখানে জল ফুটে যে বাষ্প হয় সেই বাষ্প ঐ ঠান্ডা থালাকে ছুঁয়ে ঠান্ডা হয়ে যায়। একসময় ঠান্ডা থালার গায়ে ছোটো ছোটো জলের ফোঁটা তৈরি হয়। তাহলে বাষ্প থেকে ঠান্ডা হয়ে জল তৈরি হওয়াও অবস্থারই পরিবর্তন।

নীচের প্রশ্নগুলো নিয়ে তোমরা আলোচনা করো, প্রয়োজনে শিক্ষিকা/শিক্ষকের সাহায্য নাও :

(১) রোদ্দুরে যখন ভিজে গামছা রাখা হয়, গামছা শুকিয়ে যায়। জলটা কোথায় যায়?

(২) শীতকালে ঘাসে যে শিশির জমে তা আসে কোথা থেকে?

(৩) জল ছাড়া আর কী কী জিনিস ঠান্ডা করলে জমে যেতে দেখেছ?

(৪) শীতকালে নারকেল তেলের শিশিতে তেল জমে কঠিন হয়ে গেছে। কী করে শিশির মধ্যে কিছু না ঢুকিয়ে তুমি তেল বার করে মাথায় মাখবে?

(৫) সুতির জামা ইস্ত্রি করার সময় কাপড়ে একটু জল ছিটিয়ে রাখা হয়। এই অল্প ভিজে কাপড়ে গরম ইস্ত্রি ঘষলে কী হতে দেখবে?

প্রকৃতিতে জলের অবস্থার পরিবর্তন

সূর্যের তাপে সমুদ্র-নদী-পুকুর থেকে জল বাষ্প হয়। বাতাসে জলীয় বাষ্প মিশে মাটি থেকে উঁচুতে ওঠে এবং ঠান্ডা হয়। ঠান্ডা হতে হতে একসময় হাওয়ায় ভাসমান ধুলোর কণাকে আশ্রয় করে ছোটো ছোটো জলের ফোঁটা সৃষ্টি করে। এই জলের ফোঁটা দিয়েই মেঘ তৈরি হয়। কখনো কখনো সেই জল আরো ঠান্ডা হয়ে বরফের টুকরোও তৈরি করে। কালবৈশাখী ঝড়ের সময় এই বরফের টুকরোগুলো যখন এসে পড়ে আমরা বলি 'শিল পড়ছে'। 'শিলা' মানে পাথর। যদিও ওগুলো পাথর নয়, তবুও কঠিন তো বটেই। ওই শিলা থেকেই শিল কথাটা এসেছে।

মনে রাখা জরুরি :

- কঠিনের নিজস্ব আকৃতি ও আয়তন আছে, গ্যাসের নিজস্ব আকৃতি বা আয়তন কোনোটাই নেই।
- গ্যাসেরও ভর আছে, পরীক্ষায় তাও মাপা যায়।
- বরফের ওপরে ধোঁয়ার মতো যা দেখা যায় সেটা আসলে ধোঁয়া নয়, ওটা জলীয় বাষ্প থেকে তৈরি হওয়া ছোটো ছোটো জলকণার সমষ্টি।

তোমরা এই বিষয়ে চতুর্থ শ্রেণির ' পরিবেশের উপাদান: জড়বস্তুর জগৎ' অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে জানবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. ঠিক উত্তর নির্বাচন করো :

১.১ দাঁড়িপাল্লা দিয়ে যা মাপা হয় তা হলো কোনো বস্তু — (ক) কতটা ভারী (খ) কতটা লম্বা (গ) কতটা জায়গা জুড়ে থাকে (ঘ) কতটা গরম ।

১.২ কঠিন থেকে তরলে বস্তুর অবস্থার পরিবর্তনের একটি উদাহরণ হলো — (ক) জল থেকে বাষ্প হওয়া (খ) বাষ্প থেকে জল হওয়া (গ) বরফ থেকে জল হওয়া (ঘ) জল থেকে বরফ হওয়া।

২. শূন্যস্থান পূরণ করো :

তরল ও গ্যাসের নিজস্ব _____ নেই।

৩. ঠিক বাক্যের পাশে '✓' আর ভুল বাক্যের পাশে '×' চিহ্ন দাও :

৩.১ প্রত্যেক বস্তুরই কিছুটা ভর আছে।

৩.২ কঠিনের নিজস্ব কোনো আয়তন নেই।

৪. একটি বাক্যে উত্তর দাও :

তরল ও গ্যাসের মধ্যে কোনটা সহজে ছড়িয়ে পড়ে?

৫. দুটি বা তিনটি বাক্যে উত্তর দাও :

৫.১ একটি বরফ ভরতি গ্লাসের গায়ে জলের ফোঁটা কীভাবে তৈরি হয়?

৫.২ কীভাবে বুঝবে যে গ্যাসেরও ভর আছে?

3 শরীর

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- দাঁতের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- দাঁতের যত্ন নেওয়ার উপায় আলোচনা করতে পারবে।
- খাবার হজম হওয়ার ধাপগুলি বর্ণনা করতে পারবে।
- বিভিন্ন কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি কীভাবে খাবার থেকে পাওয়া যায় তা আলোচনা করতে পারবে।
- প্রশ্বাস ও নিশ্বাসের প্রাথমিক ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

দাঁত

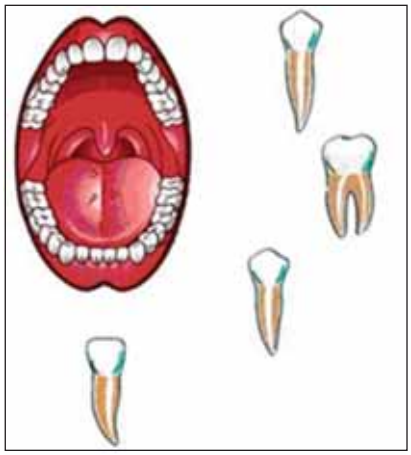

আমরা খাবার খাই। খাবার যাওয়ার সময় দাঁত দিয়ে খাবার চিবোই। তারপর খাবার হজম হয়। আমাদের মুখে চার ধরনের দাঁত থাকে। চার ধরনের দাঁতের চার রকমের কাজ। কাটা, ছেঁড়া, ভাঙা আর গুঁড়ো করা।

এসো এবারে দাঁতের সম্বন্ধে জেনে নিই। পাশের ছবিটা দেখো। ছবিতে দেখতে পাচ্ছো যে দাঁতের বেশিরভাগ অংশটিই মাড়ির ভেতরে থাকে। দাঁতের খুব অল্প অংশই মাড়ির বাইরে থাকে।

সুস্থ দাঁতের ভেতরের ছবি

জেনে রাখো : মাড়ির বাইরে থাকা দাঁতের অংশটাই হলো শরীরের সবচেয়ে কঠিন অংশ।

তোমরা বুঝতেই পারছো যে দাঁত কতটা দরকারী। তাই দাঁত ভালো রাখতে হলে দাঁতের যত্ন নিতেই হবে।

দাঁতের যত্ন কীভাবে নেবে

- দিনে দু-বার দাঁত মাজতে হবে।
- কোনো কিছু খাওয়ার পরেও ভালো করে মুখ ধুয়ে নিতে হবে। না হলে দাঁত খারাপ হয়ে যেতে পারে।

খারাপ হয়ে যাওয়া দাঁতের ভেতরের ছবি

খাবার খাওয়ার পর দাঁত মাজা বা মুখ ধোয়া দরকার কেন? খাবার খাওয়ার সময় দাঁতের ফাঁকে খাবারের টুকরো আটকে যেতে পারে। দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবারের টুকরোয় বাসা বাঁধে কিছু জীব, যাদের খালি চোখে দেখা যায় না। এই সব জীবরাই দাঁতকে খারাপ করে দেয়। দাঁত খারাপ হয়ে গেলে দাঁত তুলে ফেলতে হতে পারে। তাহলে বুঝতেই পারছো যে দাঁতের যত্ন নেওয়া কতটা জরুরি।

খাবার কীভাবে হজম হয়

- তোমরা জানো যে খাবার খাওয়ার সময় দাঁত দিয়ে চিবোতে হয়। দাঁত দিয়ে খাবারকে ভেঙে টুকরো করা হয়। এটাই হলো হজমের প্রথম ধাপ।
- আমাদের মুখের আশেপাশে থাকে কয়েকটা লালাগ্রন্থি। খাবার চিবোনোর সময় লালাগ্রন্থি থেকে বেরোনো লালারস খাবারের সঙ্গে মেশে। লালারসে থাকে হজমের রস। হজম করানো ছাড়াও লালারস খাবারকে দলা পাকিয়ে দেয়। যাতে খাবার সহজেই গলা দিয়ে নেমে যায়।

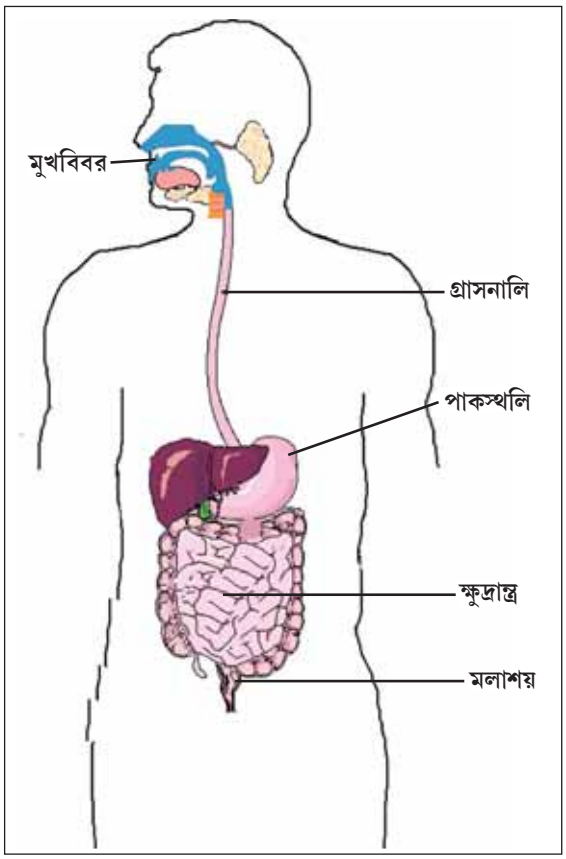

জেনে রাখো : তোমরা হয়তো ভাবছো, 'হজম' শব্দটার মানে কী? হজম মানে হলো খাবারকে খুব ছোটো ছোটো কণায় ভেঙে ফেলা। যাতে খাবারের ওই কণাগুলো শরীর খুব সহজেই নিয়ে নিতে পারে।

- আমাদের গলার ভেতরে পাশাপাশি দুটো নল আছে। একটা নল দিয়ে খাবার যায়। আর অন্য নলটা দিয়ে বাতাস যায়।
- খাবার যাওয়ার নলটার গলার পরের অংশের নাম গ্রাসনালি। এই নল দিয়ে খাবার নীচে নেমে যায়।
- এই নলের শেষে একটা থলির মতো অংশ আছে। তার নাম পাকস্থলি। পাকস্থলিতে খাবারের কিছুটা অংশ হজম হয়। হজমের রসের সঙ্গে মিশে খাবার ছোটো কণায় পরিণত হয়।
- এরপর আরও নীচে নেমে খাবার পৌঁছোয় প্যাঁচালো নলের মতো একটা অংশে। এর নাম অন্ত্র। অন্ত্রের একটা অংশ ক্ষুদ্রান্ত্র। এখানে খাবারের একটা অংশ হজম হয়। হজমের রসের সঙ্গে মিশে খাবারের কণাগুলো আরও ছোটো হয়। এইভাবে ছোটো হতে হতে খাবারের কণাগুলো শরীরের রক্তে মিশে যাওয়ার মতো হয়। খাবারের যে অংশটা হজম হয় না তা মল হিসেবে মলাশয়ে কিছুক্ষণ জমা থাকে। তারপরে শরীর থেকে বাইরে বেরিয়ে যায়।

আমরা খাবার কেন খাই?

ওপরের ছবিতে দেখানো কাজগুলো করতে তোমার শক্তি প্রয়োজন হয়। এই শক্তি কোথা থেকে পাও বলোতো? খাবার থেকেই এই শক্তি পাওয়া যায়।

ফাঁকা বাক্সে কী শব্দ বসবে ভেবে লেখো।

খাবার	→	শক্তি	→	

কাজ করার জন্য ..... প্রয়োজন হয়।

এসো এবারে দেখা যাক খাবার থেকে কীভাবে শক্তি পাওয়া যায়।

- আমরা বাতাস থেকে শ্বাস নিই। একে বলে প্রশ্বাস।
- আমাদের গলার ভেতরে পাশাপাশি দুটো নল আছে। একটা দিয়ে খাবার যায়। আর অন্যটা নিয়ে বাতাস যায়। এই বাতাস যাওয়ার নলটা হলো শ্বাসনালি।
- শ্বাসনালির শেষে দুটো থলির মতো অংশ আছে। এরা হলো ফুসফুস।
- প্রশ্বাস নেওয়ার সময় বাতাস নাক দিয়ে ঢুকে শ্বাসনালি দিয়ে ফুসফুসে পৌঁছোয়। অনেকসময় আমরা মুখ দিয়েও প্রশ্বাস নিই। তবে মুখ দিয়ে প্রশ্বাস নিলেও বাতাস কিন্তু শ্বাসনালি দিয়েই ফুসফুসে পৌঁছোয়।

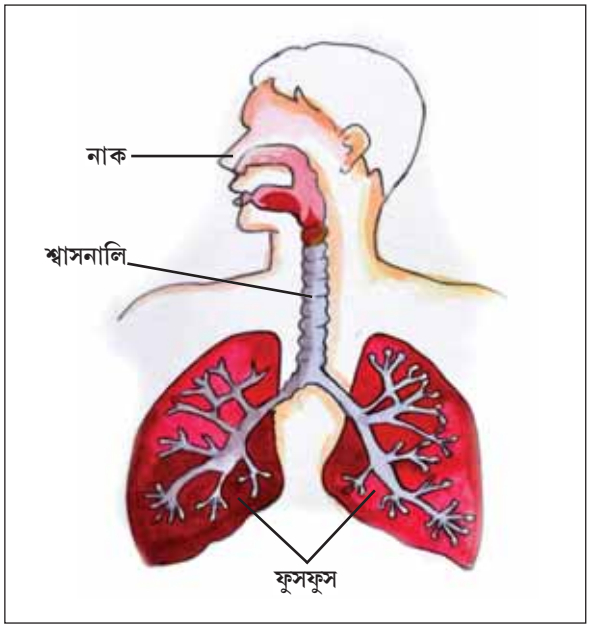

- বাতাসের একটা উপাদান হলো অক্সিজেন গ্যাস। বাতাস ফুসফুসে পৌঁছোনোর পরে ফুসফুস বাতাস থেকে ওই অক্সিজেন গ্যাসটাকে টেনে নেয়। এই অক্সিজেন গ্যাসটাই শরীরের ভেতরে গিয়ে খাবার থেকে শক্তি বের করতে সাহায্য করে।
- এই শক্তিটাই আমরা নানা কাজে ব্যবহার করি।
- আমরা যেমন শ্বাস নিই, তেমনই আমরা শ্বাসও ছাড়ি। শ্বাস ছাড়াকে বলে নিশ্বাস।
- নিশ্বাস ছাড়ার সময় কিছুটা বাতাস আমাদের শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। এই বাতাসের সঙ্গেই আমাদের শরীরে তৈরি হওয়া কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস শরীর থেকে বেরিয়ে যায়।
- প্রশ্বাস আর নিশ্বাসকে একসঙ্গে বলে শ্বাসক্রিয়া।
- শ্বাসক্রিয়ার সময় পরিমাণ মতো অক্সিজেন শরীরে ঢুকলে তবেই স্বাস্থ্য ভালো থাকে।

খাবার থেকে শক্তি পাই কীভাবে?

খাবার → (হজম) [ ] → (অক্সিজেন) [ ] → কাজ

প্রশ্বাসের সময় যে পথে বাতাস শরীরে ঢুকেছিল, নিশ্বাসের সময় আবার সেই পথেই বাতাস শরীর থেকে বাইরে বেরিয়ে যায়। তবে নিশ্বাসের পথটা প্রশ্বাসের পথের ঠিক উল্টো।

প্রশ্বাসের পথ : নাক → শ্বাসনালি → ফুসফুস

তাহলে এবারে নিশ্বাসের পথটা লিখে ফেলো।

নিশ্বাসের পথ : [ফুসফুস] → [ ] → [ ]

মনে রাখা জরুরি :

- চার ধরনের দাঁতের চার রকমের কাজ — কাটা, ছেঁড়া, ভাঙা আর গুঁড়ো করা।
- দাঁত ভালো রাখতে হলে দাঁতের যত্ন নিতেই হবে।
- হজম মানে হলো খাবারকে খুব ছোটো ছোটো কণায় ভেঙে ফেলা।
- লালারসে হজমের রস থাকে।
- কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি খাবার থেকে পাওয়া যায়।
- শ্বাসনালির শেষে দুটো থলির মতো অংশ আছে। এরা হলো ফুসফুস।
- প্রশ্বাস আর নিশ্বাসকে একসঙ্গে বলে শ্বাসক্রিয়া।

তোমরা এই বিষয়ে চতুর্থ শ্রেণির 'শরীর' অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে জানবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. ঠিক উত্তর নির্বাচন করো :

লালারস নিঃসৃত হয় যেখান থেকে সেটি হলো — (ক) পাকস্থলি (খ) মলাশয় (গ) মুখবিবর (ঘ) ক্ষুদ্রান্ত্র।

২. শূন্যস্থান পূরণ করো :

২.১ খাবারের যে অংশটা হজম হয় না তা _____ হিসেবে শরীর থেকে বাইরে বেরিয়ে যায়।

২.২ দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবারে বাসা বাঁধা _____ দাঁতকে খারাপ করে।

২.৩ _____ মানে হলো খাবারকে খুব ছোটো ছোটো কণায় ভেঙে ফেলা।

৩. ঠিক বাক্যের পাশে '✓' আর ভুল বাক্যের পাশে '×' চিহ্ন দাও :

৩.১ পাকস্থলি থেকে খাবার পৌঁছোয় মলাশয়ে।

৩.২ কোনো খাবার খাওয়ার পরে ভালো করে মুখ ধুয়ে নেওয়ার দরকার নেই।

৪. একটি বাক্যে উত্তর দাও :

৪.১ গ্রাসনালি দিয়ে খাবার কোথায় পৌঁছোয়?

৪.২ কাজ করার শক্তি কোথা থেকে পাওয়া যায়?

৫. একটি বা দুটি বাক্যে উত্তর দাও :

খাবার হজম করা দরকার কেন?

৬. দুটি বা তিনটি বাক্যে উত্তর দাও :

দাঁত কেন খারাপ হয়ে যায়?

নমুনা প্রশ্নপত্র ১

১. ঠিক উত্তর নির্বাচন করো :

১.১ শিরদাঁড়া আছে যে প্রাণীর সেটি হলো— (ক) কেঁচো (খ) কৃমি (গ) কেন্নো (ঘ) সাপ।

১.২ তরল থেকে কঠিনে বস্তুর অবস্থার পরিবর্তনের একটি উদাহরণ হলো — (ক) জল থেকে বাষ্প হওয়া (খ) বাষ্প থেকে জল হওয়া (গ) বরফ থেকে জল হওয়া (ঘ) জল থেকে বরফ হওয়া।

২. শূন্যস্থান পূরণ করো :

২.১ পাহাড়ি অঞ্চলে জন্মানো একটি গাছ হলো _____।

২.২ দাঁতের বেশিরভাগ অংশটাই _____ ভিতরে থাকে।

২.৩ মুখের মধ্যে _____ খাবারকে দলা পাকিয়ে দেয়।

২.৪ ভর ছাড়াও কঠিন বস্তুর নিজস্ব আকৃতি এবং _____ আছে।

২.৫ জল ফুটলে তরল থেকে _____ তৈরি হয়।

৩. ঠিক বাক্যের পাশে '✓' আর ভুল বাক্যের পাশে '×' চিহ্ন দাও :

৩.১ শ্যাওলা একটি জড় পদার্থ।

৩.২ চিংড়ির শিরদাঁড়া আছে।

৩.৩ প্রতিদিন দুবার করে দাঁত মাজা উচিত।

৩.৪ শ্বাসক্রিয়ার সময় পরিমাণ মতো কার্বন ডাইঅক্সাইড শরীরে ঢুকলে তবেই স্বাস্থ্য ভালো থাকে।

৩.৫ বরফের ওপরে সাদা ধোঁয়ার মতো যে জিনিসটা দেখতে পাওয়া যায়, তা আসলে ধোঁয়া নয়।

৩.৬ গ্যাসের নিজস্ব আয়তন নেই ।

৪. একটি বাক্যে উত্তর দাও :

৪.১ জলে থাকে এমন একটি প্রাণীর নাম লেখো।

৪.২ খাবার হজম করার প্রক্রিয়ায় দাঁতের কাজ কী?

৪.৩ শরীরের সবচেয়ে কঠিন অংশ কোনটি?

৪.৪ বাতাস যে নালি দিয়ে ফুসফুসে পৌঁছোয় তার নাম কী?

৪.৫ কঠিন ও গ্যাসের মধ্যে কোনটি সহজে ছড়িয়ে পড়ে?

৪.৬ বাষ্প থেকে তরল তৈরি হওয়ার একটি উদাহরণ দাও।

৪.৭ কাচ দিয়ে তৈরি হয় এমন একটি বস্তুর নাম লেখো।

৫. একটি বা দুটি বাক্যে উত্তর দাও :

৫.১ রুইমাছ ও চিংড়ির একটি মিল ও একটি অমিল লেখো।

৫.২ কেন্নোকে ছুঁলে গোল হয়ে যায়। কিন্তু টিকটিকিকে ছুঁলে গোল হয় না কেন?

৫.৩ দাঁত ভালো রাখতে হলে আমাদের কী কী করা উচিত?

৫.৪ জল ভরতি গ্লাসে আঙুল ডোবালে কী হবে তা লেখো।

৬. দুটি বা তিনটি বাক্যে উত্তর দাও :

৬.১ ‘‘প্রাণীরা একে অন্যকে খেয়ে বেঁচে থাকে’’ — উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করো।

৬.২ খাবার হজম করতে লালাগ্রন্থি কীভাবে সাহায্য করে?

৬.৩ কী কী কারণে বিভিন্ন জীব হারিয়ে যাচ্ছে?

৬.৪ একটি বরফ ভরতি গ্লাসের গায়ে জলের ফোঁটা কীভাবে তৈরি হয়?

৬.৫ কীভাবে বুঝবে যে গ্যাসেরও ভর আছে?

৬.৬ জলের তিনধরনের অবস্থার পরিবর্তনের উদাহরণ লেখো।

4 আবহাওয়া ও বাসস্থান

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- জীবজগতে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে।
- বাতাসের উপাদানগুলি তালিকাভুক্ত করতে পারবে।
- স্বাভাবিক বায়ু ও দূষিত বায়ুর তুলনা করতে পারবে।
- বিভিন্ন ঋতুর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবে।
- জীবের বিভিন্ন ধরনের বাসস্থান বর্ণনা করতে পারবে।

তোমরা জানো বাতাস ছাড়া আমরা, পশুপাখি, গাছপালা কেউই বাঁচতে পারি না। গাছপালা, প্রাণী সকলেরই জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাতাসের অক্সিজেন।

জীবনের জন্য বাতাস

আমরা যখন প্রশ্বাস নিই, বাতাসের অক্সিজেন আমাদের শরীরে যায়। তাই বাতাসে প্রয়োজনমতো অক্সিজেন না থাকলে আমাদের শ্বাসকষ্ট হয়।

নীচের ঘটনাগুলির ফলাফল লেখো।

ঘটনা	ফলাফল
তুমি সিঁড়ি বেয়ে পাঁচতলায় উঠলে	
মাছকে জল থেকে মাটিতে তুললে	
একটি গাছের চারার ওপর কাচের ঢাকনা চাপা দিয়ে কিছুদিন রেখে দিলে	

এবার জেনে নিই কীভাবে এই অক্সিজেনের সাহায্যে জীবেরা বেঁচে থাকে —

- সবুজ উদ্ভিদ পরিবেশ থেকে বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড নিয়ে খাবার তৈরি করে এবং পরিবেশে অক্সিজেন ত্যাগ করে।
- সবুজ উদ্ভিদ বা গাছেরা তাদের শ্বাসক্রিয়া চালানোর জন্য পরিবেশ থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে।
- প্রাণীরা তাদের শ্বাসক্রিয়ার জন্য পরিবেশ থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে।

ভেবে নিয়ে নীচের ফাঁকা জায়গা উপযুক্ত শব্দ দিয়ে পূরণ করো।

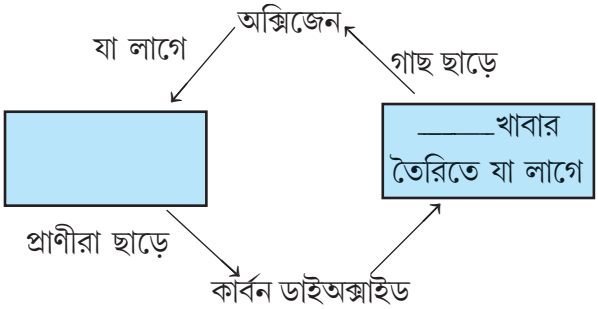

বাতাসের নানা উপাদান

তোমরা জানো শীতের সময় ভেজা জামাকাপড় তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়, কিন্তু বর্ষাকালে শুকোতে দেরি হয়। এর প্রধান কারণ বর্ষাকালে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি হওয়া। এবার জেনে নিই বাতাসে কী কী থাকে —

- সূর্যের তাপে পুকুর, নদী, সাগরের জল শুকিয়ে বাতাসে মেশে। জলের ওই গ্যাসীয় অবস্থাই হলো জলীয় বাষ্প। মাটি থেকে অনেক উঁচুতে এই জলীয় বাষ্প ঠান্ডা হয়। ঠান্ডা অবস্থায় এই জলীয় বাষ্প বাতাসে ভেসে থাকা সূক্ষ্ম ধূলোকণা ও নানা কঠিন কণাকে আশ্রয় করে জলকণায় পরিণত হয়। এই জলকণাই বাতাসে মেঘ হিসেবে ভেসে বেড়ায়।
- গাড়ি চললে, জোরে বাতাস বইলে, ধূলিঝড় হলে, কয়লা ভাঙলে, পাথর ভাঙলে নানা কঠিন কণা বাতাসে মেশে।
- লেপ-তোশক বানানোর সময়, পাটের দড়ি, বস্তা তৈরির সময় তার রোঁয়া বাতাসে মেশে। আবার ফুলের রেণুও বাতাসে মিশে থাকে।
- এছাড়া আছে নানারকম বর্ণহীন গ্যাস। যেমন— নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, বিভিন্ন নিষ্ক্রিয় গ্যাস, কার্বন ডাইঅক্সাইড।

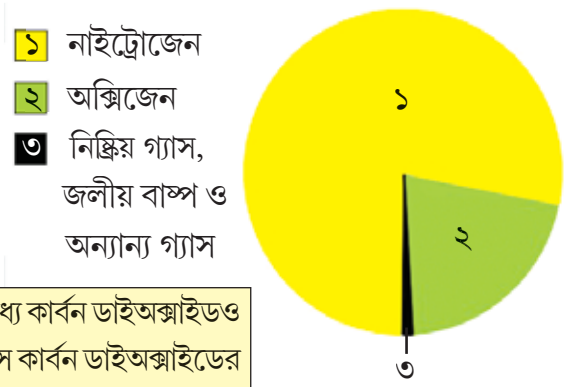

পাশের ছবিটা দেখো। বাতাসের মধ্যে থাকা উপাদান কোনটা কতটা আছে তা বিভিন্ন রং-এ দেখানো হয়েছে। তোমাদের বোঝার জন্য ছবিতে রং দেওয়া হলো।

★ অন্যান্য গ্যাসের মধ্যে কার্বন ডাইঅক্সাইডও থাকে। কিন্তু বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ এতই কম যে তা এই ছবিতে দেখানো সম্ভব নয়।

দূষিত বাতাস

তোমরা বাতাসের যে উপাদানগুলির কথা জানলে তা সবজায়গায় একই পরিমাণে থাকে না। কলকারখানা, গাড়ির থেকে বেরোনো ধোঁয়া-ধুলো বাতাসে মিশে বাতাসকে দূষিত করে তোলে। তাই এগুলো হলো বাতাসের অবাঞ্ছিত উপাদান।

কলকারখানার দূষিত ধোঁয়া

ছবিগুলো দেখে পকেটবোর্ডে ঠিক কার্ডের জোড়গুলো বেছে নাও।

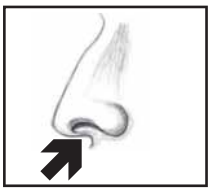

	পকেট বোর্ড	

অক্সিজেন
জলকণা
কার্বন ডাইঅক্সাইড, ধোঁয়া, ধুলিকণা

ঋতুর আনাগোনা

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায় বাতাসের অবস্থা। আবার একই সময়ে বিভিন্ন জায়গায় বাতাসের অবস্থা পালটে যায়। কখনও গরম, কখনও ঠান্ডা, কখনও ভেজা ভেজা বা স্যাঁতস্যাঁতে, আবার কখনও ঝড়-বৃষ্টি। বাতাসের বিভিন্ন উপাদানের কম-বেশি হওয়ার কারণে এগুলি হয়। বাতাসের এই অবস্থা, যা যেকোনো সময় বদলাতে পারে তাকে বলে **আবহাওয়া**। আবার বছরের যে সময়টা জুড়ে একটানা প্রায় একইরকম আবহাওয়া থাকে তাকে বলে **ঋতু**। এবার আমরা আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ঋতু সম্পর্কে সংক্ষেপে জেনে নেবো।

ঋতুর নাম	সময়কাল	বৈশিষ্ট্য
গ্রীষ্ম	বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য (এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে জুনের মাঝামাঝি সময়)	সূর্যের তাপে চারদিক প্রচণ্ড উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। নদী, খাল, বিল শুকিয়ে যায়। ভীষণ গরম পড়ে, বিকেলের দিকে মাঝে মাঝে কালবৈশাখী ঝড় হয়।
বর্ষা	আষাঢ়-শ্রাবণ (জুনের মাঝামাঝি থেকে অগাস্টের মাঝামাঝি সময়)	আকাশে সাধারণত কালো মেঘ দেখা যায়। মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত হয়, বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকে। নদী, খাল, বিল জলে ভরে ওঠে।
শরৎ	ভাদ্র-আশ্বিন (অগাস্টের মাঝামাঝি থেকে অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়)	আকাশে পেঁজা তুলোর মতো সাদা মেঘ ভাসে। সাধারণত রোদ ঝলমলে পরিষ্কার আকাশ, এইসময় বেশি গরম বা ঠান্ডা কোনোটাই পড়ে না।
হেমন্ত	কার্তিক-অগ্রহায়ণ (অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়)	বায়ুর উষ্ণতা কমতে শুরু করে, বৃষ্টি প্রায় হয় না।
শীত	পৌষ-মাঘ (ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়)	মাঝারি থেকে বেশি ঠান্ডা পড়ে। উত্তর দিক থেকে বাতাস বয়, বৃষ্টি প্রায় হয় না, আকাশ পরিষ্কার থাকে। সাধারণত ভোরবেলায় চারদিক কুয়াশায় ঢেকে যায়।
বসন্ত	ফাল্গুন-চৈত্র (ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি থেকে এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়)	মনোরম আবহাওয়া, খুব বেশি গরম বা ঠান্ডা পড়ে না। এইসময় মৃদু বাতাস বয়।

ছবি দেখে ঋতুগুলো চিনে নাও

গ্রীষ্ম

বর্ষা

শরৎ

হেমন্ত

শীত

বসন্ত

নীচের সারণির ছবিগুলি দেখে দলে আলোচনা করে ঋতুর নাম ও একটি করে বৈশিষ্ট্য লেখো।

ঋতুর ছবি	ঋতুর নাম	বৈশিষ্ট্য	ঋতুর ছবি	ঋতুর নাম	বৈশিষ্ট্য

ঋতু বদল ও আমরা

ঋতু বদলের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদেও নানা পরিবর্তন আসে। গ্রীষ্মকালে আম, জাম, কাঁঠাল প্রভৃতি ফল পাওয়া যায়। এইসময় ঢেঁড়শ, লাউ, পটল, ঝিঙে প্রভৃতি নানারকম সবজি পাওয়া যায়। তোমরা রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করো। আবার এইসময় বর্ষবরণের অনুষ্ঠানও করা হয়। গরমকালে আমরা হালকা সুতির পোশাক পরি। বর্ষাকালে নদী, খাল, বিল জলে ভরে ওঠে। আবার অতিরিক্ত বৃষ্টিতে ও বন্যায় মানুষের অনেক ক্ষয়ক্ষতিও হয়। শরৎকালে কাশফুলে মাঠ ভরে যায়, আমরা নানা উৎসব পালনে মেতে উঠি। হেমন্তকালে ফসল কাটা শুরু হয়। ঘরে ঘরে পালিত হয় নবান্ন উৎসব। শীতকালে শরীর গরম রাখতে আমরা উলের পোশাক পরি। এই সময় নানা ধরনের শাক-সবজি, কমলালেবু, কুল প্রভৃতি পাওয়া যায়।

✸ **শব্দভাণ্ডার থেকে উপযুক্ত শব্দ বেছে কোনটি কোন ঋতুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তা নীচের সারণিতে লেখো।**

শব্দ	ঋতুর নাম

শব্দভাণ্ডার

শিউলি, কাশফুল, আম, কাঁঠাল, লিচু, কমলালেবু, দুর্গাপুজো, বাঁধাকপি, ফুলকপি, নবান্ন, বর্ষাতি, ছাতা, মাফলার, লেপ, সোয়েটার, গ্লাভস (হাতমোজা), হালকা সুতির পোশাক, ঘন কালো মেঘ, পেঁজা তুলোর মতো মেঘ, মাটি ফেটে যাওয়া, গাছের পাতা ঝরে পড়া, রথযাত্রা।

আমাদের চারপাশের উদ্ভিদ আর প্রাণীর বাসস্থান

আমাদের চারপাশে আছে নানা ধরনের ছোটো-বড়ো প্রাণী। আর তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ এরা আলাদা আলাদা জায়গায় থাকে বা বেড়ে ওঠে। যে অনুকূল পরিবেশে কোনো জীব থাকে বা বেড়ে ওঠে তাকে সেই জীবের বাসস্থান বা থাকার জায়গা বলে। কোনো জীব খাদ্য, জল, আশ্রয় ও অন্যান্য প্রয়োজনের জন্য তার বাসস্থানের উপর নির্ভরশীল।

কে কোথায় থাকে

আমাদের এই বিশাল পৃথিবীর কোথাও আছে খুব উঁচু জায়গা, কোথাও আছে বিরাট সমুদ্র, কোনো জায়গা আবার সাদা বরফে ঢাকা, কোথাও আছে বিরাট রুক্ষ মরুভূমি। এই বিচিত্র প্রাকৃতিক পরিবেশে নানা ধরনের জীব বাস করে। প্রতিটি জীব প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে শেখে।

তোমরা জানো বাঘ আর সিংহ জঙ্গলে থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে তারা থাকে আলাদা আলাদা জঙ্গলে। আমাদের রাজ্যের সুন্দরবন অঞ্চলের বাদাবনে থাকে বাঘ, আবার গুজরাটের গির অরণ্যে থাকে সিংহ। দার্জিলিং-এর খুব ঠান্ডায় দেখা যায় রেডপান্ডা। তোমরা জানো মরুভূমির প্রাণী উট। খুব কম জল পেলেও শুষ্ক মরুভূমির পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে তারা বেঁচে থাকে। সাপ থাকে গর্তে। আবার কিছু প্রাণী যেমন — কেঁচো, কেন্নো গর্ত খুঁড়ে মাটির ভেতর থাকে।

রেডপান্ডা

উট

কেঁচো

জেনে রাখো

চিতাবাঘ

চিতা

চিতাবাঘ আর চিতা কিন্তু এক নয়। তাদের আলাদা করে চিনবে কী করে? চিতাবাঘ আর চিতা - এদের দুজনের গায়েই ছোপ আছে। চিতাবাঘের গায়ে কালো ছোপ ছোপ থাকে। ছোপগুলো ভরাট নয়। কালো ছোপগুলোর মাঝে আবার হালকা বাদামি রঙের ছোপ থাকে। আর চিতার গায়ে দেখা যায় কালচে গোল বা ডিম্বাকৃতির ছোপ। ছোপগুলো কিন্তু ভরাট। এছাড়াও চিতার চোখের কোণ থেকে মুখের দুপাশ পর্যন্ত কালো 'অশ্রু রেখা' থাকে। এটা আবার চিতাবাঘের থাকে না।

চিতাবাঘের চামড়া

চিতার চামড়া

পাখিদের বাসস্থানেও বৈচিত্র্য চোখে পড়ে। চড়াই পাখিদের বাসস্থান বাড়ির ঘুলঘুলি, ঘরের চালের নীচ। আবার বাবুই পাখি তালগাছে এক বিশেষ ধরনের বাসা তৈরি করে। উটপাখিরা মরুভূমি ও প্রায় শুষ্ক তৃণভূমি অঞ্চলে থাকে।

বাবুই পাখি ও তার বাসা

বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ বা গাছ নানা ধরনের পরিবেশে জন্মায় ও বেড়ে ওঠে। যেমন— সাধারণত সমুদ্রের ধারের নোনা মাটিতে নারকেল গাছ, লালমাটিতে পলাশ গাছ জন্মায়। আবার পাইন গাছ দেখা যায় উঁচু পার্বত্য অঞ্চলে। এছাড়াও পুকুর ধারের স্যাঁতস্যাঁতে মাটিতে অনেক কলমীশাক জন্মায়। আবার মরুভূমিতে জন্মায় ক্যাকটাস বা কাঁটাগাছ। কাঁটাগাছের পাতার জায়গায় কাঁটা থাকে, ফলে তারা শুকনো পরিবেশে খুব কম জল পেলেও বেঁচে থাকে।

পাইন গাছ

পলাশফুল

ক্যাকটাস

কলমীশাক

শব্দভাণ্ডার দুটি থেকে উদ্ভিদ / প্রাণীর নাম এবং তাদের থাকার জায়গা বেছে নিয়ে নীচের সারণি পূরণ করো। প্রয়োজনে উদ্ভিদ / প্রাণীর থাকার জায়গাগুলি একের বেশিবার নিতে পারো।

শব্দভাণ্ডার - ১

উদ্ভিদ / প্রাণীর নাম
চিতা, উটপাখি, সাপ,সিংহ, পলাশফুল, বাবুই পাখি, কলমীশাক, রেডপান্ডা, উট,বাঘ, কাক, নারকেল গাছ, পলাশ ফুল

শব্দভাণ্ডার - ২

উদ্ভিদ / প্রাণীর থাকার জায়গা
বাদাবন, তালগাছ, পুকুরের ধার, জঙ্গল, মরুভূমি ও প্রায় শুষ্ক তৃণভূমি, দার্জিলিং, উঁচু পাহাড়ি অঞ্চল, লালমাটির অঞ্চল

উদ্ভিদের নাম	থাকার জায়গা	প্রাণীর নাম	থাকার জায়গা

তোমার এলাকার চারপাশের উদ্ভিদ ও প্রাণীর নাম এবং তাদের থাকার জায়গার তালিকা তৈরি করো।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর নাম	থাকার জায়গা

তোমরা জানো, বিভিন্ন ধরনের মাছের প্রাকৃতিক বাসস্থান হলো নদী, সমুদ্রের জল। আবার বিভিন্ন জীবাণুদেরও বাসস্থান আছে। কিছু কিছু জীবাণু প্রাকৃতিক পরিবেশে থাকে, আবার কিছু জীবাণু মানুষের দেহের খাবারের নালিতে, ফুসফুসে, চোখে, কানে বাসা বাঁধে। বিভিন্ন উদ্ভিদ ও অন্যান্য জীবের দেহেও জীবাণুরা থাকে।

জেনে রাখো

জীবাণু হলো একধরনের জীব যাদের খালি চোখে দেখা যায় না। কোনো কোনো জীবাণু প্রাণী ও উদ্ভিদের শরীরে ঢুকলে নানা রোগের সৃষ্টি হয়।

এবার আমরা জানবো কীভাবে বিভিন্ন প্রাণী একে অপরের বাসস্থান হয়ে ওঠে। যেমন— মানুষের মাথার চুলে থাকে উকুন, খাদ্যনালিতে থাকে কৃমি, গন্ডারের পিঠে পোকা থাকে। এইভাবে বিভিন্ন জীব নানা পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে গড়ে তুলেছে তাদের বাসস্থান।

হারিয়ে যাচ্ছে বাসভূমি

তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ অনেক প্রাণীর সংখ্যা ক্রমশ কমে আসছে। কেউ প্রায় লুপ্ত হয়ে আসছে। আবার কোনো প্রাণী লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। যেমন আজ থেকে প্রায় কয়েক কোটি বছর আগে পৃথিবী থেকে ডাইনোসর লুপ্ত হয়ে গেছে।

যখন কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদ প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে না, তখন তারা ধীরে ধীরে হারিয়ে যায় বা লুপ্ত হয়ে যায়। এছাড়া মানুষের নানারকম কাজকর্মের জন্য প্রাণী বা উদ্ভিদের থাকার জায়গা নষ্ট হয়ে যায়। পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা যত বাড়ছে ততই তাদের জন্য বাড়ি-ঘর, রাস্তাঘাট, আরও নানান কিছু তৈরি করতে হচ্ছে। জলাজমি বুজিয়ে গাছ কেটে শহর তৈরি হচ্ছে। ফলে সেইসব গাছ বা জলাভূমিতে যেসব প্রাণী ও উদ্ভিদরা থাকত ধীরে ধীরে তাদের প্রাকৃতিক বাসস্থান নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

সিংহ

মুগা রেশম মথের শূককীট

জেনে রাখো

যে সব প্রাণী বা উদ্ভিদ পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাচ্ছে বা নিশ্চিহ্ন হওয়ার মুখে তাদের বলে লুপ্তপ্রায় প্রাণী বা লুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ।

একসময়ে মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে সিংহ ও চিতা একসঙ্গে থাকত। কিন্তু মানুষের অত্যাচারে একদিন সেই জঙ্গল থেকে তারা হারিয়ে গেল। গুজরাটের গির অরণ্যে শুধু ভারতীয় সিংহ দেখা যায়। আরও একটি প্রাণী হলো আসামের মুগা রেশম মথ। এইসব প্রাণীদের থাকার জায়গা ক্রমশ কমে যাচ্ছে। বিভিন্ন বিপন্ন প্রাণী বা উদ্ভিদের বাঁচিয়ে রাখতে তাদের আলাদাভাবে যত্ন নিতে হবে। একে বলে **জীব সংরক্ষণ**। আমরা যেহেতু উদ্ভিদ ও প্রাণীদের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকি, তাই নিজেদের জন্য এদের রক্ষা করা প্রয়োজন।

শিক্ষিকা / শিক্ষকের সাহায্যে বিপন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীদের তালিকা তৈরি করো এবং তাদের বাসস্থান ধ্বংস হবার কারণ ও কেন তাদের বাঁচানো দরকার তা দলে আলোচনা করে সারণিতে লেখো।

বিপন্ন উদ্ভিদ / প্রাণী	বাসস্থান ধ্বংস হওয়ার কারণ	বিপন্ন প্রাণী বা উদ্ভিদকে কেন বাঁচানো প্রয়োজন

মনে রাখা জরুরি :

- অবাঞ্ছিত উপাদান বাতাসে মিশে বাতাসকে দূষিত করে তোলে।
- কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানের নির্দিষ্ট সময়ের বাতাসের বিশেষ অবস্থাকে বলে আবহাওয়া।
- বছরের নির্দিষ্ট সময় জুড়ে কোনো জায়গায় প্রায় একইরকম আবহাওয়া থাকে, একে বলে ঋতু।
- যে অনুকূল পরিবেশে কোনো জীব থাকে বা বেড়ে ওঠে তাকে সেই জীবের বাসস্থান বলে।

তোমরা এই বিষয়ে চতুর্থ শ্রেণির 'আবহাওয়া ও বাসস্থান' অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে জানবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. **ঠিক উত্তর নির্বাচন করো :**

উঁচু পাহাড় চূড়ায় বাতাসে অক্সিজেন — (ক) থাকে না (খ) কমে যায় (গ) বেড়ে যায় (ঘ) একই থাকে।

২. **শূন্যস্থান পূরণ করো :**

জলীয় বাষ্প _____ হয়ে মেঘ তৈরি হয়।

৩. **ঠিক বাক্যের পাশে '✓' আর ভুল বাক্যের পাশে '×' চিহ্ন দাও :**

চিতা ও চিতাবাঘ একই প্রাণী।

৪. **একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

মরু অঞ্চলের একটি প্রাণীর নাম উল্লেখ করো।

৫. **একটি বা দুটি বাক্যে উত্তর দাও :**

বাতাসের অবাঞ্ছিত উপাদানগুলি কী কী?

৬. **দুটি বা তিনটি বাক্যে উত্তর দাও :**

যদি একটি বড় গাছ কেটে ফেলা হয়, তবে কোন কোন জীবের বাসস্থান হারিয়ে যেতে পারে এবং অন্য কোন কোন জীব কীভাবে বিপন্ন হয় বা হতে পারে তা নিজের ভাষায় লেখো।

5 আমাদের আকাশ

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- ছায়ার সাহায্যে সারাদিনে সূর্যের অবস্থানের পরিবর্তন এবং তার সাপেক্ষে পৃথিবীর আবর্তনের গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারবে।
- দিন-রাত্রি কেমনভাবে ঘটে তা সহজ পরীক্ষা করে দেখাতে পারবে।
- আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কৃত্রিম উপগ্রহের গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবে।

তোমরা জানো, দিনের আলোর একমাত্র উৎস হলো সূর্য। তাই সূর্য যেদিকে থাকবে তার বিপরীতে তৈরি হবে ছায়া। বিকেলে যখন সূর্য পশ্চিমদিকে তখন তোমার ছায়া থাকবে পূর্বদিকে। তাহলে ছায়ার দিকে মুখ করে দাঁড়ালে সামনে পূর্বদিক, পিছনে পশ্চিম, ডানদিকটা দক্ষিণ আর বাঁদিকটা উত্তর — এভাবে নিজেদের ছায়া দেখেই তোমরা দিক ঠিক করতে পারো। দিনের বিভিন্ন সময়ে নিজের ছায়া লক্ষ করলে দেখবে ছায়ার দৈর্ঘ্য বদলে যাচ্ছে। এসো এবার জেনে নিই কীভাবে ছায়ার দৈর্ঘ্য বদলে যায়।

ছায়ার দৈর্ঘ্যের বাড়া কমা

সকাল সাতটায় সূর্য যখন পূর্বদিকে তখন তোমার ছায়া পড়বে পশ্চিমে। ছায়ার দৈর্ঘ্য হবে অনেক বড়ো। যখন সকাল দশটা, সূর্য পূর্বদিকে এবং তোমার ছায়া পড়বে পশ্চিমদিকে। কিন্তু ছায়ার দৈর্ঘ্য আগের তুলনায় ছোটো হবে। আবার দুপুর বারোটার সময় সূর্য থাকবে প্রায় মাথার উপরে আর ছায়া তৈরি হবে পায়ের কাছাকাছি। এরপর ছায়ার দৈর্ঘ্য ক্রমশ বাড়তে থাকবে। ছায়া তৈরি হবে পূর্বদিকে। সারাদিন ধরে আকাশে সূর্যকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে সরতে দেখা যায় বলে এরকম হয়। নীচের ছবিটা দেখে বিষয়টা আরও ভালোভাবে বুঝে নাও।

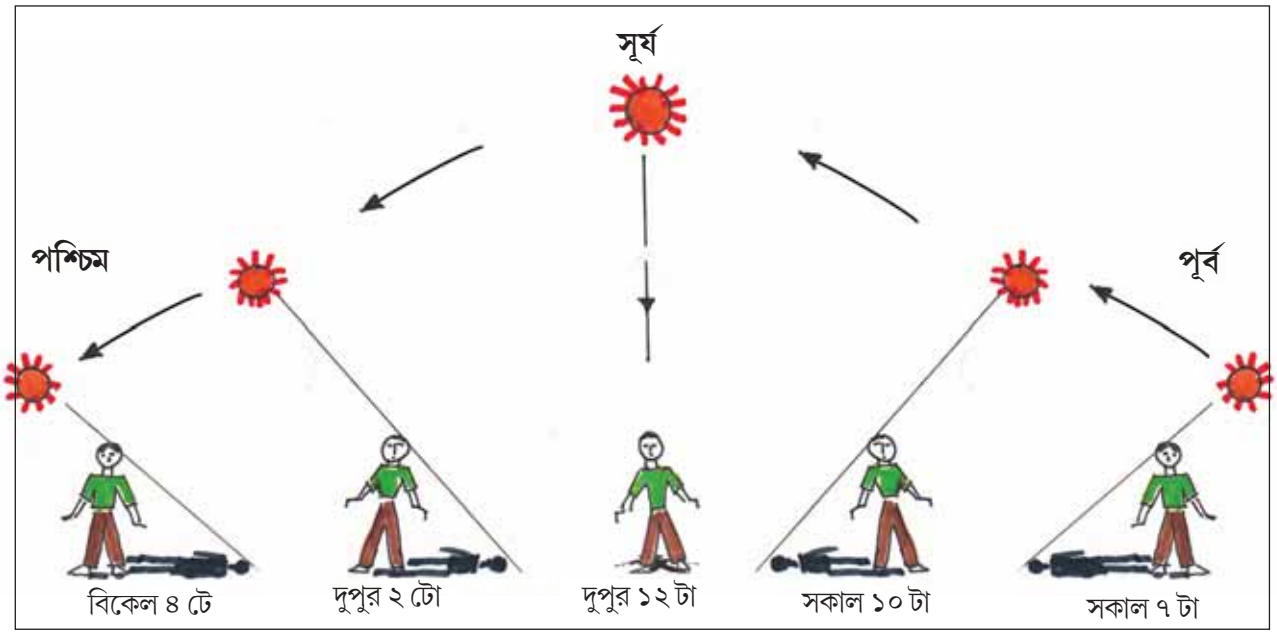

মাঠের মাঝে একটা লাঠি পুঁতে দিনের বিভিন্ন সময়ে সূর্যের আলোয় লাঠির ছায়ার মাপ নাও। পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত খাতায় লেখো।

পরীক্ষার সময়	পর্যবেক্ষণ	সিদ্ধান্ত
ভোরবেলা		
সকাল সাড়ে নটা		
বেলা বারোটা		
বিকেলবেলা		

দিন রাত সৃষ্টির রহস্য

তোমরা প্রতিদিন দেখো সূর্য পূর্ব আকাশে ওঠে আর পশ্চিম আকাশে অস্ত যায়। চলন্ত ট্রেনের জানলায় ধারে বসলে মনে হয় যেন বাইরের সবকিছু পিছনের দিকে সরে যাচ্ছে। আসলে ট্রেনটাই তাদের পিছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে। তেমনি পৃথিবী নিজে ঘুরছে বা পাক খাচ্ছে বলে আমরা সূর্যকে পূর্বে উঠতে আর পশ্চিমে অস্ত যেতে দেখি।

পৃথিবীর পাক খাওয়া অনেকটা লাট্টুর মতো। তোমরা নিজেরাই একটা ছোটো পরীক্ষা করে বিষয়টা বুঝে নিতে পারো। একটা অন্ধকার ঘরে মোমবাতি বা টর্চ জ্বালিয়ে তার ঠিক পাশেই একটা লাট্টু ঘুরিয়ে দাও। ঘুরতে ঘুরতে লাট্টুর একটা অংশ আলোর দিকে আসবে, আরেকটা অংশ থাকবে অন্ধকারে। আবার পরে অন্ধকার অংশটা চলে আসবে টর্চ বা মোমবাতির আলোয়। পৃথিবীও অনেকটা এরকমভাবেই পাক খাচ্ছে। ঘোরার সময় পৃথিবীর যে অংশ সূর্যের আলোর সামনে আসে সেখানে হয় দিন আর উল্টোদিকে হয় রাত। এইভাবে পৃথিবীর সবজায়গায় দিন ও রাত হয়।

দিন ও রাত

তোমাদের শিক্ষিকা/শিক্ষক একটা বল ও টর্চ বা মোমবাতি শ্রেণিকক্ষে নিয়ে আসবেন। একটা টেবিলের একদিকে বল ও আর একদিকে টর্চ বা মোমবাতি রাখবেন। এবার তোমরা দলে ভাগ হয়ে শিক্ষিকা/শিক্ষকের সামনে বলটিকে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ধীরে ধীরে ঘোরাও। কী কী ঘটনা ঘটলো সেই সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত নীচের সারণিতে লেখো।

পর্যবেক্ষণ	সিদ্ধান্ত

ইতোমধ্যেই তোমরা জেনেছ যে পৃথিবী তার নিজের চারদিকে পাক খায়। পৃথিবীর যে জায়গায় দিন হয় তার উল্টোদিকে হয় রাত। আর এই রাত শেষ হয়ে দিনের শুরু হলো ভোরবেলা। এই ভোরের আলোয় তাপ কম থাকে। পৃথিবী পাক খাওয়ার জন্য দিন শেষ হয়ে বিকেল গড়িয়ে আসে। এইসময়ও আলোর তাপ যথেষ্ট কম থাকে। বিকেলের শেষ আর রাতের শুরু হলো সন্ধ্যাবেলা।

সন্ধের আকাশ

গরমকালে ভোর পাঁচটায় রোদ উঠে যায়। কিন্তু শীতকালে সেইসময় অন্ধকার থাকে। সুতরাং গরমকালে দিন বড়ো আর রাত ছোটো। আবার শীতকালে এর ঠিক উল্টোটা ঘটে।

পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ

পৃথিবী একটা গ্রহ। আর চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে অবিরাম ঘুরে চলেছে। তাই চাঁদ হলো পৃথিবীর উপগ্রহ। পৃথিবীর মতো চাঁদেরও নিজস্ব কোনো আলো নেই। সূর্যের আলো চাঁদের উপর পড়ে আমাদের চোখে আসে, তখন আমরা চাঁদকে দেখতে পাই।

চাঁদ

চাঁদের পরিবেশ

পৃথিবীর মতো চাঁদেও অনেক উঁচু উঁচু পাহাড় আর বড়ো বড়ো গর্ত আছে। চাঁদ পৃথিবী থেকে অনেক দূরে থাকায় ওগুলো তোমরা কালো দাগের মতো দেখো। এই দাগগুলোকে আমরা বলি চাঁদের কলঙ্ক।

চাঁদের ঘোরার পথ

সূর্যের মতো চাঁদকেও আমরা পূর্বদিকে উঠতে আর পশ্চিমদিকে অস্ত যেতে দেখি। সেটা শুধু পৃথিবীর ঘোরার জন্য নয়, চাঁদও পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে বলে। কিন্তু জানো কি আমরা সবসময় চাঁদের একটা পিঠ দেখতে পাই? একটা সহজ পরীক্ষার সাহায্যে বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করো। টেবিলের ওপর একটা বড়ো বল আর তার থেকে কিছুটা দূরে একটা টর্চ জ্বালিয়ে রাখো। ঘরটা অন্ধকার করে দাও। লক্ষ রেখো, টর্চের আলো যেন ভালোভাবে বলের উপর পড়ে। এবার একটু দূরে গিয়ে বলটাকে চারপাশ থেকে দেখো। দেখবে, বলটার একটা অংশে আলো পড়ছে আর অন্য দিকটা থাকছে অন্ধকারে। পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে চাঁদ। কিন্তু সূর্যের আলোয় চাঁদের একটা পিঠ আলোকিত থাকছে।

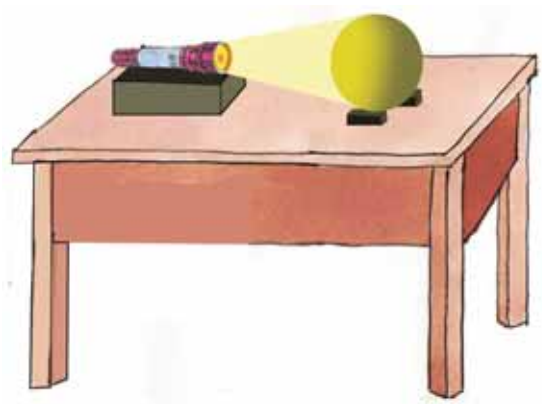

ভেবে দেখো, পৃথিবীর চারদিকে ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদও সরে সরে যাচ্ছে। তাই দিনের পর দিন চাঁদের আকৃতি আমরা বদলে যেতে দেখি। সূর্য, চাঁদ আর পৃথিবীর কোনো কোনো বিশেষ অবস্থানে চাঁদের একটা পিঠ পুরোপুরি আলোকিত হয়। এবার ধরো চাঁদের সেই আলোকিত অংশ থেকে আলো আমাদের চোখে এসে পড়ল। তখন আমরা চাঁদকে গোল থালার মতো দেখব। আর ওই দিন হবে পূর্ণিমা। এরপর রোজই চাঁদের আকৃতি একটু করে বদলে যাবে। কখনও তা কাস্তের মতো আবার কখনও বা কমলালেবুর কোয়ার মতো দেখাবে।

চাঁদের আলোকিত অংশের বাড়া-কমা

এইভাবে একদিন রাতের আকাশে চাঁদকে আর দেখতে পাবো না। ওই দিন হবে অমাবস্যা। কারণটা কী জানো? অমাবস্যার দিনেও চাঁদের এক পিঠে সূর্যের আলো পড়ে। কিন্তু সেই আলোকিত অংশ থেকে কোনো আলোই পৃথিবীর দিকে আসে না। তাই সেদিন চাঁদকে দেখা যায় না।

মহাকাশ অভিযান ও ভারত

তোমরা জানলে যে চাঁদ পৃথিবীর প্রাকৃতিক উপগ্রহ। আবার মানুষও কিছু উপগ্রহ তৈরি করেছে, সেগুলি হলো **কৃত্রিম উপগ্রহ**। এই উপগ্রহ তৈরি করে রকেটের সাহায্যে পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা মহাকাশে পাঠান।

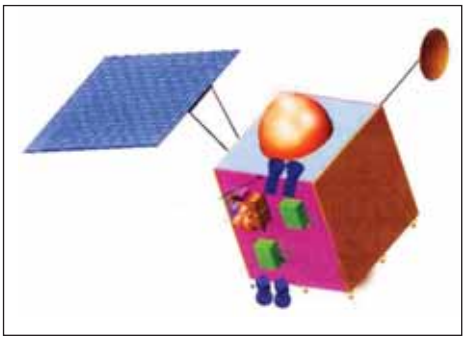

কৃত্রিম উপগ্রহ

আমরা এইসব উপগ্রহের সাহায্যেই আবহাওয়ার খবর জানতে পারি, টিভিতে স্যাটেলাইট চ্যানেল দেখতে পারি, ফোনে যোগাযোগ করতে পারি। কৃত্রিম উপগ্রহ কোনো অঞ্চলের মানচিত্র তৈরিতে কাজে লাগে। ভারত থেকে ইনস্যাট নামে অনেকগুলো কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠানো হয়েছে মহাকাশে।

আমাদের দেশ থেকে চাঁদে পাঠানো হয়েছিল ‘চন্দ্রযান - I’ এবং ‘চন্দ্রযান - II’। ভারতের বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সময়ে অনেক কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে পাঠিয়েছেন যা তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করছে।

মনে রাখা জরুরি :

- আলোর গতিপথে কোনো অস্বচ্ছ বস্তু থাকলে আলো যেতে বাধা পায়। ফলে ছায়া তৈরি হয়।
- চাঁদ হলো পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ যা পৃথিবীর চারদিকে পশ্চিম থেকে পূর্বে অবিরাম ঘুরছে।
- কৃত্রিম উপগ্রহ হলো বিজ্ঞানীদের তৈরি উপগ্রহ, যা চাঁদের মতো পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে এবং এতে ক্যামেরা বসানো থাকে বিভিন্ন ছবি তোলার জন্য। রকেটের সাহায্যে এগুলোকে মহাকাশে পাঠানো হয়।

তোমরা এই বিষয়ে চতুর্থ শ্রেণির 'আমাদের আকাশ' অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে জানবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. ঠিক উত্তর নির্বাচন করো :

১.১ ভোর পাঁচটায় অন্ধকার থাকে — ক) গ্রীষ্মকালে খ) বর্ষাকালে গ) শীতকালে ঘ) শরৎকালে।

১.২ কৃত্রিম উপগ্রহ — ক) আবহাওয়ার খবর দেয় খ) ব্যক্তিগত খবর সংগ্রহ করে গ) আলো দেয় ঘ) দিন-রাতের পরিবর্তন ঘটায়।

২. শূন্যস্থান পূরণ করো :

গরমকালে দিনের দৈর্ঘ্য _____ হয়।

৩. ঠিক বাক্যের পাশে '✓' আর ভুল বাক্যের পাশে '×' চিহ্ন দাও :

দুপুর ১২টার সময় ছায়ার দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি হয়।

৪. একটি বাক্যে উত্তর দাও :

সূর্যকে পূর্বে উঠতে ও পশ্চিমে অস্ত যেতে দেখা যায়। তাহলে পৃথিবী কোনদিক থেকে কোনদিকে ঘুরছে?

৫. একটি বা দুটি বাক্যে উত্তর দাও :

পূর্ণিমার সময় চাঁদকে গোল থালার মত দেখায় কেন?

৬. দুটি বা তিনটি বাক্যে উত্তর দাও :

ভারতের মহাকাশ অভিযান সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

6 প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের অভিজ্ঞতা

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- বাঁচার জন্য জল কেন প্রয়োজন তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- আগুনের ব্যবহারের ফলে মানুষের জীবনে কী কী পরিবর্তন এসেছিল তা বর্ণনা করতে পারবে।
- গাছ, পশু-পাখি আমাদের কীভাবে উপকার করে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- পাথরের ব্যবহার, ধাতুর ব্যবহার ও চাকার ব্যবহার মানুষকে কী কী সুবিধে দিয়েছিল তা বিশ্লেষণ করতে পারবে।

বাঁচার জন্য জল

জল প্রকৃতির দান। জল না থাকলে সত্যিই খুব অসুবিধে হয়। পানীয় জল হলো সবচেয়ে দরকারি। বাসস্থানের কাছাকাছি জল থাকলে সুবিধে। তাই অনেক আগে থেকেই মানুষ ঝরনা, নদী বা জলাশয়ের কাছাকাছি থাকতে শুরু করেছিল।

জলপথে আসা-যাওয়া করা যায়। মাছ ধরা যায়। চাষের খেতে জল দিতে সুবিধে হয়।

জল না থাকলে পৃথিবীতে প্রাণই সৃষ্টি হতো না। এখনও পর্যন্ত জানা গেছে একমাত্র পৃথিবী গ্রহেই প্রাণ আছে। তার একটা বড়ো কারণ পৃথিবীতে জল আছে। জলেই প্রথম জীবের জন্ম হয়েছিল।

আগুনের ব্যবহার

পুরোনো দিনের মানুষেরা যখন আগুন জ্বালাতে শিখল, তারপর তারা আগুনের নানা সুবিধে পেল।

তার আগে তারা ঠান্ডায় কষ্ট পেত। অন্ধকারে থাকত। কাঁচা খাবার খেত।

তারপর মানুষ আগুন জ্বেলে ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচল।

রান্না করতে না পারলেও আগুনে খাবার ঝলসে নিত।

বন্য পশুর হাত থেকে বাঁচতে আগুনের ভয় দেখাত।

আগুন জ্বেলে তারা অন্ধকার দূর করল।

আগুনে পুড়িয়ে মাটির পাত্র, ইট, খেলনা তৈরি করল।

গাছ আমাদের প্রাণ

মানুষ যখন ঘরবাড়ি বানানো শেখেনি, গাছই ছিল তার থাকার জায়গা। কখনো কখনো গাছের ওপর মাচা বেঁধেও থাকত।

হিংস্র পশুদের থেকে বাঁচতে গাছের শক্ত ডাল হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করত।

তারা গাছ থেকে ফল পেড়ে খেত।

কৃষিকাজ শেখার পর গাছের গুরুত্ব আরও বেড়ে গেল। মানুষ গম, যব, ধানের বীজ জমিয়ে রাখতে শিখল।

নানা গাছের চারা পুঁতে তাদের বাঁচিয়ে রাখার ভাবনাও এল।

পোষ মানা পশু-পাখি

আগেকার মানুষ প্রথমেই পশুকে পোষ মানাতে পারেনি। তারা শিকার করে পশুর মাংস খেত।

পরে মানুষ বুঝেছিল পশুকে পোষ মানালে অনেক সুবিধে। সারা বছর ধরে মাংস, দুধ আর চামড়া পাওয়া যাবে।

মানুষ কুকুরকে পোষ মানিয়েছিল আত্মরক্ষার প্রয়োজনে।

হাঁস, মুরগির মতো পাখিদের পোষ মানিয়েছিল সারা বছর ধরে ডিম ও মাংস পাবার জন্য।

মানুষের জীবনে পশুপাখিদের গুরুত্ব আস্তে আস্তে বেড়েছিল।

পাথরের ব্যবহার

মানুষ গুহাতে থাকার সময় থেকেই পাথর ব্যবহার করত। হিংস্র পশুর সঙ্গে লড়াইতে চারপাশে পড়ে থাকা পাথরই ছিল তাদের হাতিয়ার।

পাথর ভেঙে তৈরি মোটামুটি তিনকোনা আকৃতির টুকরো দিয়ে তৈরি করত হাত কুঠার।

আবার পাথরের ধারালো টুকরো দিয়ে মাংস থেকে চামড়া ছাড়ানো হতো।

পাথরের তৈরি তির বা বর্শার ফলা শিকার করতে সাহায্য করত।

চকমকি পাথরের সাহায্যে আগুন জ্বালাতো।

রঙিন পাথর দিয়ে মালা বানাতো।

তাছাড়া ঘরবাড়ি তৈরি করতেও পাথর ব্যবহৃত হতো।

ধাতুর ব্যবহার

মানুষের প্রথম কাজের ধাতু হলো তামা। আজ থেকে অনেক আগে মানুষ প্রকৃতিতে তামা খুঁজে পায়।

প্রকৃতিতে যে তামা পাওয়া যেত তাকে পিটিয়ে পিটিয়ে মানুষ খুব দরকারি দুটো জিনিস তৈরি করেছিল। লাঙল আর কাস্তে।

ব্রোঞ্জ হলো তামা আর টিনের মিশ্রণ। ব্রোঞ্জ তামার চেয়ে শক্ত। এতে মানুষের চাষের যন্ত্রপাতি আর অস্ত্রশস্ত্র তৈরির খুব সুবিধে হলো।

এরপর একসময় মানুষ পৃথিবীতে এসে পড়া উল্কাখণ্ড থেকেই লোহা খুঁজে পায়। লোহার জিনিস শক্ত ও ধারালো। এতে কাজের সুবিধে হলো। চাষের জমি আরও বাড়ল, জঙ্গল কেটে বসতি গড়ে উঠল।

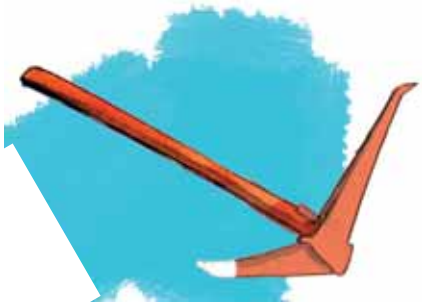

প্রতিদিনের কাজে চাকা

মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে চাকা বানিয়েছে। তবে একদিনে হঠাৎ করে চাকা তৈরি করতে পারেনি।

হয়তো পাহাড় থেকে পাথর গড়িয়ে পড়তে দেখেছিল। তার থেকে মাথায় এসেছিলো চাকার ধারণা।

প্রথমে কাঠ দিয়েই চাকা বানাত।পাথরের চাকাও তৈরি করতে শিখেছিল তারা।

একসময় মানুষ ধাতুর ব্যবহার শিখল। এরপর চাকাকে শক্তপোক্ত করার জন্য লোহার বেড় দিয়েছিল।

রাবারের চাকা তৈরি হওয়া শুরু হয় অনেক পরে। তাতে গাড়ি দ্রুত চলতে শুরু করে।

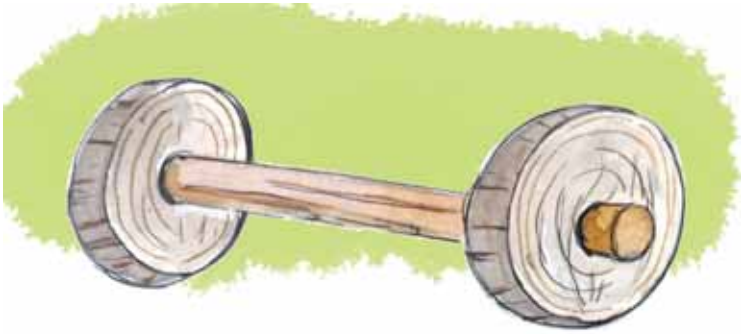

সাপের কামড় থেকে সাবধান

সাপের দাঁতের নীচে বিষথলিতে বিষ থাকে। তারা ভয় পেয়ে নিজেদের বাঁচাতে মানুষকে কামড়ায়। বিষাক্ত সাপে কামড়ালে সময়মতো চিকিৎসা না হলে মানুষ মারাও যেতে পারে।

এসো দেখি সাপে কামড়ালে আমরা কী করতে পারি।

১. ক্ষতস্থান জল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে ফেলা দরকার।	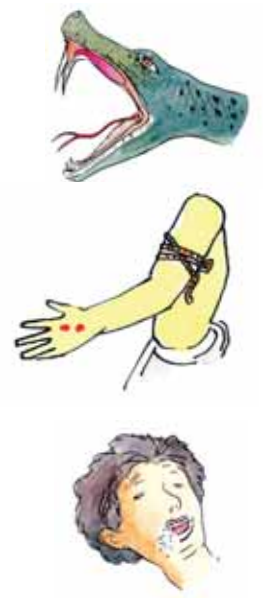
২. হাতের বাহুতে / পায়ের উরু অংশে দড়ি হালকা করে বাঁধতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে প্রতি এক-দেড় ঘণ্টা পরে বাঁধন খুলে আবার যেন হালকা ভাবে বাঁধা হয়।	
৩. সময় নষ্ট না করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া।	
৪. রোগী যাতে ভয় না পায় সেই বিষয়ে সাহস দেওয়া।	
৫. বমি করতে চাইলে বমি করতে দেওয়া।	
৬. শ্বাসকষ্ট হলে মুখে মুখ লাগিয়ে শ্বাস দেওয়া।	

রোগ সারাতে গাছ

তোমরা জানো আমাদের চারপাশের নানা গাছ আমাদের রোগ সারাতে পারে। এসব উদ্ভিদকে ভেষজ উদ্ভিদ বলে।

সে অনেক আগের কথা। মানুষ তখন জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত। শাকপাতা ফলমূল খেয়ে বেঁচে থাকত। সেই সময় থেকেই শরীর খারাপ হলে গাছপালা ও তার শিকড়বাকড় খেয়ে রোগ সারাত।

এসো জেনে নেওয়া যাক বিভিন্ন রোগে কয়েকটি ভেষজ উদ্ভিদ কীভাবে উপকার করে।

- গলায় ব্যথা হলে বাসক পাতা, মিছরি, গোলমরিচ জলে ফুটিয়ে গরম জলটা খেলে উপকার পাওয়া যায়।
- সর্দি-কাশিতে তুলসী ভালো কাজ করে।
- পেটের অসুখে থানকুনি পাতার রস কার্যকরী।
- নয়নতারা আমাশয়ে উপকারী।
- শরীরের কোথাও কেটে গিয়ে বা ছড়ে গিয়ে রক্তপাত হলে, দূর্বা থেঁতো করে সেই জায়গায় লাগালে রক্ত পড়া বন্ধ হয়।
- শরীরের কোথাও ব্যথা লাগলে চুন-হলুদ গরম করে লাগালে আরাম পাওয়া যায়।
- কালমেঘ রক্ত আমাশয়ে উপকারী। এছাড়া কৃমি নিরাময়েও সাহায্য করে।
- অর্জুন গাছের ছাল জলে ভিজিয়ে খেলে হার্টের অসুখে উপকার পাওয়া যায়।
- রক্তাল্পতায় কুলেখাড়া উপকারী।
- সিঙ্কোনা গাছের ছাল থেকে ম্যালেরিয়া রোগের ওষুধ তৈরি হয়।

নীচের তালিকাতে কিছু ভেষজ উদ্ভিদের ছবি দেওয়া হলো। ওই উদ্ভিদগুলি কোন রোগ সারাতে ব্যবহার করা হয় নীচে লিখে ফেলো।

ভেষজ উদ্ভিদের ছবি	কোন রোগ সারাতে ব্যবহার করা হয়
তুলসী	
নয়নতারা	
কালমেঘ	
থানকুনি	
কুলেখাড়া	

মনে রাখা জরুরি :

- বাঁচার জন্য জলের প্রয়োজন। পৃথিবীতে জল আছে তাই প্রাণ আছে।
- আগুন জ্বালাতে শেখার পর মানুষ আগুনের নানা সুবিধে পেল।
- গাছ আমাদের নানাভাবে সাহায্য করে।
- মানুষ বুঝেছিল পশুকে পোষ মানালে অনেক সুবিধে।
- পাথর ও ধাতুর ব্যবহার মানুষের জীবনে অনেক পরিবর্তন ঘটিয়েছিল।
- চাকা মানুষের জীবনে গতি এনে দিয়েছে।
- রোগ সারাতে ভেষজ উদ্ভিদ সাহায্য করে।

তোমরা এই বিষয়ে চতুর্থ শ্রেণির 'প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের অভিজ্ঞতা' অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে জানবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. **ঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো :**

মানুষের প্রথম কাজের ধাতু হলো— (ক) তামা (খ) টিন (গ) ব্রোঞ্জ (ঘ) লোহা।

২. **শূন্যস্থান পূরণ করো :**

উল্কাখণ্ড থেকে মানুষ খুঁজে পেয়েছিল _____।

৩. **ঠিক বাক্যের পাশে '✓' আর ভুল বাক্যের পাশে '×' চিহ্ন দাও :**

৩.১ একমাত্র পৃথিবী গ্রহেই প্রাণ আছে।

৩.২ ভেষজ উদ্ভিদ আমাদের রোগ সারাতে পারে।

৩.৩ ব্রোঞ্জ হলো তামা আর লোহার মিশ্রণ।

৪. **একটি বা দুটি বাক্যে উত্তর দাও :**

৪.১ গাছ আমাদের কেমনভাবে উপকার করে?

৪.২ ভেষজ উদ্ভিদ কাকে বলে?

৪.৩ আগুনের ব্যবহারের ফলে মানুষ কী কী সুবিধে পেয়েছিল?

7 জীবিকা ও সম্পদ

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- অঞ্চলভেদে জীবিকার পরিবর্তন কেন হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- বাংলার কোন অঞ্চলের মানুষ কোন জীবিকার সঙ্গে যুক্ত, তার তালিকা তৈরি করতে পারবে।
- হাতের কাজের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- বিভিন্ন ধরনের লোকগান ও নাচের ধারা ও বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করতে পারবে।

কত জায়গায় কত রকম জীবিকা

নানান অঞ্চলে নানা ধরনের জীবিকা তোমরা দেখতে পাবে। কে কোথায় থাকেন তার ওপর তাঁর জীবিকার ধরন অনেকটাই নির্ভর করে। চাষ করা বা মাছ ধরার মতো জীবিকা নানা অঞ্চলে দেখা যায়।

আমাদের রাজ্যে ভূভাগটা সব জায়গায় সমান নয়। কোথাও উঁচু পাহাড়, কোথাও মালভূমি। আবার কোথাও শুধু চাষের জমি। এছাড়াও আছে নদী, সমুদ্র, জঙ্গল। ভূ-প্রকৃতিগত এই পার্থক্য জীবিকার ধরনেও পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

দার্জিলিং-এ কত মানুষ বেড়াতে যান। স্থানীয় মানুষ গাড়িতে করে তাঁদের ঘোরান। হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করে দেন। খাবার বা শীতের পোশাক ওইসব পর্যটকদের বিক্রি করেন। দার্জিলিং-এ চা-পাতা তৈরির কারখানা আছে।

পাহাড়ে ধান, স্কোয়াশের চাষ হয়। আর হয় কমলালেবু, নাসপাতির মতো ফল। উঁচু-নীচু ভূমিভাগ হওয়ায় ফসল চাষ ভালোভাবে করা যায় না। পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে চাষবাস করতে হয়।

বীরভূম, বাঁকুড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বহু মানুষ পাথরের খাদানে কাজ করেন। তোমরা রানিগঞ্জের কয়লাখনির কথা শুনেছ। বর্ধমান জেলার আরও অনেক জায়গায় কয়লা তোলা হয়। এই কয়লাকে ব্যবহার করেই গড়ে উঠেছে নানা কলকারখানা ও বিদ্যুৎ কেন্দ্র।

পাহাড় ও মালভূমির অংশটুকু বাদ দিলে পশ্চিমবঙ্গের বাকি প্রায় সব অংশই সমভূমি বা নীচু জলা জায়গা। এসব জায়গার মানুষ কৃষিকাজ, মাছধরা, ব্যবসা করা বা নানা অফিসে চাকরি করেন।

জঙ্গলের আশেপাশে যারা থাকেন তাদের অনেকে জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করেন। কেউ কেউ কাঠ চেরাইয়ের কলেও কাজ করেন।

জঙ্গল থেকে শুধু যে কাঠ পাওয়া যায় তা নয়। মধু পাতা, গাছের ঔষধি অংশ সংগ্রহ করেন জঙ্গল এলাকার মানুষ।

এছাড়াও মাছ ধরা, চিংড়ির মীন সংগ্রহ বা নৌকা তৈরিকেও অনেকে নিজেদের জীবিকা হিসেবে বেছে নিয়েছেন।

হাতের কাজ

মুখোশ	পুরুলিয়া জেলার জায়গায় জায়গায় ছড়িয়ে আছে ছৌ নাচের মুখোশ বানানোর শিল্পীরা। আঠালো মাটি, কাগজের মণ্ড, পাতলা কাগজ, গর্জন তেল, আঠা, ধুনো, পাট, নকল চুল, পাখির পালক, রাংতা, পুঁতি, শলমা-চুমকি ও রং ব্যবহার করা হয় এই মুখোশ তৈরিতে।
সিল্ক শাড়ি	বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর বিখ্যাত বিষ্ণুপুরী সিল্ক শাড়ির জন্য। মুর্শিদাবাদেও সিল্কের শাড়ি তৈরি হয়।
ডোকরা	বাঁকুড়া ও বর্ধমানের মতো অনেক জেলায় কিছু লোক মৌ-মোম আর ধুনোর ছাঁচে গলানো পিতল ঢেলে নানান ধরনের জিনিস তৈরি করেন। পিতলের এসব জিনিসগুলোকে বলা হয় ডোকরা।
পুতুল তৈরি	পটুয়ারা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় তৈরি করেন নানান জিনিসের পুতুল। বাঁকুড়ায় গেলে তোমরা দেখবে কতরকম পোড়ামাটির জিনিস।
নকশি কাঁথা	বাংলার মেয়েরা সামান্য শাড়ি, ছেঁড়া কাপড় দিয়ে বানাতেন নকশা করা কাঁথা। কাঁথার গায়ে গল্পকথা, বাঘ, সিংহ, হাতি, ঘোড়া এসব সূচ-সুতোয় ফুটিয়ে তোলা হয়।

নানা ধরনের লোকগান

বাউল গান পল্লির গান, গ্রামের মানুষেরা গায়। পল্লির গান হলো সমাজের আদি গান।

লালন ফকির ছিলেন বাংলার এক মহান সাধক বাউল। যাঁর কাছে আল্লা-হরি-রাম-রহিমের আসন ছিল সমান।

নৌকা চালানো, ছাদপেটা, মাছধরা এইসব কাজগুলোর সঙ্গেও গান গাওয়া হয়। এগুলোকে বলে সারিগান।

নানা জেলার নানা নাচ

পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম জনপ্রিয় একটি লোকনৃত্য ছৌ। পৌরাণিক কাহিনি-নির্ভর এই নাচ।

আদিবাসী মেয়েরা, সাঁওতাল মেয়েরা হাতে হাত ধরে ঝুমুর গাইতে গাইতে নাচে। পুরুলিয়া, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর মানে পুরো রাঢ়বঙ্গ জুড়েই এই নাচের প্রচলন।

মালদাতে গম্ভীরা পালা হয়। ওই পালাতেও লোকে নাচে।

মনে রাখা জরুরি :

- অঞ্চলভেদে মানুষের জীবিকার পরিবর্তন ঘটে।
- কৃষিকাজ, পশুপালন ব্যবসার পাশাপাশি জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ, মাছ ধরা, নৌকা তৈরিও অনেকের জীবিকা।
- মুখোশ, সিল্কের শাড়ি, ডোকরা, পুতুল, নকশি কাঁথা তৈরি প্রভৃতি হাতের কাজ পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায়।
- বাউল গান, সারিগান, টুসু গান, লোকগান হিসেবে প্রসিদ্ধ।
- ছৌ, ঝুমুরের মত লোকনৃত্যও জনপ্রিয়।

তোমরা এই বিষয়ে চতুর্থ শ্রেণির 'জীবিকা ও সম্পদ' অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে জানবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. **ঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো :**

গম্ভীরা পালা হয়— (ক) বীরভূমে (খ) বাঁকুড়াতে (গ) মালদাতে (ঘ) মেদিনীপুরে।

২. **শূন্যস্থানটি পূরণ করো :**

চা-পাতা তৈরির কারখানা আছে _____।

৩. **ঠিক বাক্যের পাশে '✓' আর ভুল বাক্যের পাশে '×' চিহ্ন দাও :**

৩.১ বিষ্ণুপুর সিল্কের শাড়ির জন্য বিখ্যাত।

৩.২ রানিগঞ্জে কয়লা খনি আছে।

৩.৩ জঙ্গল থেকে শুধুই কাঠ পাওয়া যায়।

৪. **একটি বা দুটি বাক্যে উত্তর দাও :**

৪.১ ডোকরা কী?

৪.২ ছৌ নাচের মুখোশ কী কী দিয়ে তৈরী করা হয়?

নমুনা প্রশ্নপত্র ২

১. ঠিক উত্তর নির্বাচন করো :

১.১ লোকগানের মধ্যে পড়ে না — (ক) বাউল গান (খ) টুসু গান (গ) গম্ভীরা পালা (ঘ) সারিগান।

১.২ সবুজ পাতায় গাছের খাবার তৈরিতে যে গ্যাস প্রয়োজন তা হলো — (ক) অক্সিজেন (খ) নাইট্রোজেন (গ) কার্বন ডাইঅক্সাইড (ঘ) নিষ্ক্রিয় গ্যাস।

১.৩ পৃথিবী পাক খায় — ক) পূর্ব থেকে পশ্চিমে খ) পশ্চিম থেকে পূর্বে গ) উত্তর থেকে দক্ষিণে ঘ) দক্ষিণ থেকে উত্তরে।

২. শূন্যস্থান পূরণ করো :

২.১ ছৌ একটি জনপ্রিয় _____।

২.২ মানুষ কুকুরকে পোষ মানিয়েছিল _____।

২.৩ প্রাণীরা _____ সময় কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসটি পরিবেশে ত্যাগ করে।

২.৪ আলো সবসময় _____ রেখায় চলে।

৩. ঠিক বাক্যের পাশে '✓' আর ভুল বাক্যের পাশে '×' চিহ্ন দাও :

৩.১ পুরোনো দিনের মানুষ চকমকি পাথরের সাহায্যে আগুন জ্বালাতো।

৩.২ বীরভূম জেলার বহু মানুষ পাথরের খাদানে কাজ করেন।

৩.৩ বাতাসের সব উপাদানগুলি সম-অনুপাতে থাকে।

৩.৪ দুপুর ১২টার সময় ছায়ার দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি হয়।

৪. একটি বাক্যে উত্তর দাও :

৪.১ পাহাড়ে উৎপাদিত হয় এমন দুটি ফলের নাম লেখো।

৪.২ চড়াই পাখি কোথায় থাকে?

৪.৩ ভোরবেলা সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে কোন দিকে তোমার ছায়া সৃষ্টি হবে?

৫. একটি বা দুটি বাক্যে উত্তর দাও :

৫.১ পাহাড়ে কেমন ধরনের চাষ হয়?

৫.২ উঁচু পাহাড়-চূড়ায় শ্বাস নিতে কষ্ট হয় কেন?

৫.৩ চাঁদের কলঙ্ক বলতে কী বোঝায় ব্যাখ্যা করো।

৬. দুটি বা তিনটি বাক্যে উত্তর দাও :

৬.১ নকশি কাঁথায় কেমন ধরনের ছবি ফুটিয়ে তোলা হত?

৬.২ তোমার প্রিয় ঋতুর নাম ও ঋতুটির দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

৬.৩ বছরের বিভিন্ন সময়ে চাঁদের আলোকিত অংশ বিভিন্ন আকারের হয় কেন?

মুদ্রক
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫৬